ভৌতিক অমনিবাস

॥ প্রাইজ ও সকল প্রকার লাইব্রেরীর উপযোগী শ্রেষ্ঠ কিশোর ভৌতিক অমনিবাস ॥

4·4

পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ ভৌতিক অমনিবাস

(প্রথম খণ্ড)

[বিভিন্ন স্বাদের কিশোর ভৌতিক কাহিনী]

[প্রতি খণ্ড স্বয়ং সম্পূর্ণ]

—ভাষান্তর ও সঙ্কলনে—

পৃথ্বীরাজ সেন

সিটি বুক এজেন্সী
প্রকাশক ও পরিবেশক
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ

প্রকাশক ঃ

পি, দে
৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯।

মুদ্রণে ঃ

নারায়ণ চন্দ্র পাল
৫৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

মূল্য ঃ বার টাকা

—উৎসর্গ—

ভূতের গল্প যারা
পড়তে ও পড়াতে ভালবাসেন
তাদের উদ্দেশ্যে—

—লেখক

ঃ গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে ঃ

ভৌতিক গল্প ব'লতে বোঝায় আটপৌঢ়ে যে-কনো সব ভূতের গল্প। কিন্তু এই সংকলন খানি সেরকম নয়। পৃথিবীর নানান দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের বিভিন্ন স্বাদের গা ছমছম করা যত সব ভূতের গল্প। গল্পের লেখকগণ যেমন স্বনামধন্য তেমনি তাঁদের লেখনীও।

আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা এই গ্রন্থ পাঠে নিশ্চয়ই কিছু বাড়তি সুযোগ আশা করতে পারেন।

—লেখক

ঃ এতে আছে ঃ

[এক]

ছোট্ট গ্রাম বিশপস্ ক্রসিং। লিভারপুল থেকে কম করে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

আঠারো শো সত্তর সালের গোড়ার কথা।

তখন এক তরুণ ডাক্তার, নাম অ্যালোইসিয়াম লানা এই গ্রামে বসবাস শুরু করেন। বলা যায় রীতিমতো খুঁটি গেড়ে আস্তানা করেছিলেন। ওঁর পিতৃপুরুষের পরিচয় কারো জানা ছিল না। তাছাড়া অখ্যাত এই গ্রামে হঠাৎ এই ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধেও লোকের ছিল অসীম কৌতূহল। তবে দুটো ব্যাপার সবাই বেশ ভালোভাবে জানতো। একটা হলো—ডাক্তার ভদ্রলোক, গ্লাসগো থেকে বেশ সম্মানের সঙ্গে ডাক্তারি পাশ করেছিলেন। অন্যটি হলো—উনি যে অয়নমণ্ডলের কোন দেশের লোক সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ভদ্রলোকের পৌরুষদীপ্ত চেহারা দেখলেই যে কোন লোকের বুঝতে অসুবিধা হবে না, উনি জাতে স্প্যানিশ। তবে গায়ের রঙ ভারতীয়দের মত শ্যামবর্ণ। মাথার চুল কুচকুচে কালো। ঘন ভুরুযুগলের নীচে অবস্থিত একজোড়া কালো চোখ। ওঁর চেহারার গুণে নতুন নাম আখ্যা পেয়েছিলেন গ্রামের মানুষদের কাছে—বিশপস্ ক্রসিং-এর কালো ডাক্তার।

গ্রামের লোকেদের কাছে উনি ছিলেন হাসির পাত্র। ওঁকে নিয়ে আড়ালে-আবডালে চলতো ঠাট্টা তামাসা। কেউ অত পরোয়া করতো না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ডাক্তার ঐ সব লোকের মনে শ্রদ্ধার আসন পাতলেন।

প্রথমে তিনি ছিলেন কেবল একজন ডাক্তার। পরে একজন সুদক্ষ

শল্য-চিকিৎসক হিসেবে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে।

লানা আসার আগে এ গ্রামে কোন ডাক্তার ছিল না। তবে একজন ভালো ডাক্তার ছিলো অবশ্য। তাঁর মৃত্যুর পরে সে স্থান শূন্য পড়ে থাকে।

দিন দিন বেড়ে চললো লানার পসার। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লাভ করলেন সম্মান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা। লর্ড বেলটনের মেজো ছেলে স্যার জেমস লোরির জটিল একটা অস্ত্রোপচার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে সম্পন্ন করার ফলে ওপর মহলেও ওঁর জনপ্রিয়তা গিয়ে পৌঁছয় একেবারে শীর্ষে। প্রত্যেকের সঙ্গে তিনি মধুর সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর মিষ্টি ব্যবহার এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রতিভাদীপ্ত সুন্দর চেহারা সবার মন কেড়ে নিয়েছিল।

বিবিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ নেই, তা তো নয়। প্রতিবেশীরা অনেক গবেষণা করে আবিষ্কার করেছিল একটা খুঁত। তাঁর হাবভাব দেখে সবাই ধরেছিল, উনি বোধহয় আজীবন নারীর সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবেন। বিরাট একটা বাড়িতে থাকতেন।

স্থানীয় ঘটকরা অনেক রূপসীদের নিয়ে হাজির করতো তাঁর কাছে। কিন্তু অবশেষে হাল ছাড়তে হয় তাদের। তিনি কার্তিক হয়েই রয়ে গেলেন।

কেউ কেউ মনগড়া কথা রটিয়ে বেড়ালো, কালো ডাক্তার ইতিমধ্যেই বিয়ের ব্যাপারটা চুকিয়ে দিয়েছেন। স্ত্রীর সঙ্গে মনের অমিল হওয়ায় এই গাঁয়ে এসে আস্তানা নিয়েছেন। আবার কারো মতে, প্রেম করতে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেয়েছেন। তাই ভুলেও মেয়েদের কাছে ঘেঁষেন না।

কিন্তু একদিন প্রত্যেকের ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হলো। শোনা গেলো ডাক্তার লানা কুমারী ফ্রান্সিস মর্টনের সঙ্গে প্রণয়াবদ্ধ হয়েছেন। এমনকি বিবাহ করবেন বলে কথা দিয়েছেন।

বিশপস্ ক্রসিং-এর জমিদার জেমস হ্যাল্ডেন মর্টনের কন্যা কুমারী ফ্রান্সিস। অবশ্য ছোট বেলায় বাবা-মাকে হারিয়ে মেয়েটি আশ্রয় নিয়েছিল একমাত্র ভাই আর্থার মর্টনের কাছে। বাপের বিশাল সম্পত্তির একমাত্র ভোগকারী হলেন কুমারী মর্টন। লম্বা পাতলা চেহারা। যেমন মিষ্টি তেমনি বুদ্ধিমতী। এককথায় বলা যায় লাবণ্যময়ী চেহারা।

একটা ঘরোয়া উৎসবে প্রথম ওঁদের আলাপ হয়। সেখান থেকেই বন্ধুত্ব। তারপর তা পরিণত হয় প্রেমে। কোন বাধা ওঁদের ভাল-বাসাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। অবশ্য ওঁদের বয়স নিয়ে অনেক মতবিরোধ শোনা যায়—ডাক্তারের বয়স সাঁইত্রিশ আর কুমারী মর্টন চব্বিশ বছরের তরুণী। নারী পুরুষের গভীর ভালোবাসার কাছে এ বাধা অতি তুচ্ছ! ফেব্রুয়ারীতে ওঁদের বাগদান হয়েছে। ডাক্তার তাঁর নতুন বধূকে ঘরে বরণ করে নিয়ে আসবেন আগস্টে।

তেসরা জুন, ডাক্তার লানা একটা চিঠি পেলেন, বিদেশ থেকে এসেছে।

বিশপস্ ক্রসিং-এ ঐ একটিমাত্র গ্রাম, আর এমন জায়গায় অবস্থিত যেখান থেকে উৎপত্তি হয় গুজবের, যেখানে সবার সঙ্গে দেখা হয়। মিষ্টার ব্যাঙ্কলে, পোস্টমাষ্টার—ওঁর পেটে কোন কথা থাকে না। প্রতিবেশীদের গোপন কথা পাঁচ কান করতে তিনি ওস্তাদ।

ডাক্তার লানার বিদেশ থেকে আসা চিঠিটা সম্বন্ধে তিনি সবাইকে জানালেন—খামটা সত্যিই ভারী অদ্ভুত। ওপরে কোন পুরুষের হাতে ঠিকানা লেখা—আর্জেন্টিনা রিপাবলিকের ডাকটিকিট সাঁটা চিঠিটা এসেছে বুয়েনস এরিস থেকে।

এর আগে 'কালো ডাক্তারের' নামে বিদেশ থেকে কোন চিঠি আসে নি। তাই পোস্টমাষ্টার খামটা খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করছিলেন এবং বিশেষ জরুরী মনে করে ডাক পিয়নকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

চৌঠা জুন, সকালবেলা কুমারী মর্টনের সঙ্গে দেখা করার জন্য ডাক্তার

বাড়ি থেকে বেরোলেন। নিরিবিলি স্থানে ওঁদের অনেকক্ষণ কথাবার্তা হয়। যখন ডাক্তার ফিরে এলো, তখন সবাই লক্ষ্য করলো, চাপা উত্তেজনায় ওঁর মুখ থমথম করছে। ফ্রান্সিসও সারাটা দিন কাটালো আবদ্ধ ঘরে। এমন কি ওর প্রিয় পরিচারিকা পর্যন্ত, এর কারণ আবিষ্কার করতে পারলো না। সে শুধু লক্ষ্য করলো, তার মনিবানি কেবল নীরবে চোখের জল ফেলছেন।

ব্যাপারটা কি জানার জন্যে লোকের আর কৌতূহলের অন্ত নেই। এক সপ্তাহের মধ্যেই সবাই জানতে পারলো, ওঁদের বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে গেছে। তারা বলাবলি করতে লাগলো, ডাক্তার লানা কুমারী মর্টনের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেছেন যে ওঁর ভাই আর্থার মর্টন ডাক্তারের পিঠের চামড়া খুলে নেবার কথা ভাবছেন।

এমন কি কারণে ডাক্তার এমন নোংরা ব্যবহার করলেন তা ছিল অজ্ঞাত। তবে উনি যে অন্যায় করেছেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ডাক্তার লানা যে রবিবারের সকালে গির্জাতে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন, যেখানে গেলে ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি—এটা কারো নজর এড়ালো না। এমন কি স্থানীয় পত্রিকায় একদিন একটা বিজ্ঞাপন বেরোলো—বিশপস্ ক্রসিং-এ চালু একটি ডাক্তারখানা বিক্রি করে দেওয়া হবে। মালিকের নাম উল্লেখ নেই। তবু কারো বুঝতে দেরী হলো না যে ডাক্তার লানা এখানকার সবকিছু বিক্রি করে তল্পিতল্পা নিয়ে কেটে পড়ার ধান্দা করছেন।

যখন এমন উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ, তখন ঘটলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। ব্যাপারটা সকলকে হতবাক করে দিলো। সারা গ্রাম তোলপাড় হয়ে উঠলো।

সেদিন একুশে জুন, সোমবার রাত্রিবেলা।

মার্থা উডস নামে একজন বৃদ্ধা মহিলা ডাক্তারবাবুর ঘরদোর দেখা-শুনা করতেন। ওঁর সহায়িকা ছিলেন মেরি পিলিং, অল্পবয়সি একটি মেয়ে।

কোচোয়ান আর অস্ত্রোপচারের কাজে সাহায্য করতো যে ছেলেটি সে বাইরে ঘুমোতো। ডাক্তারের স্টাডি রুম ছিল অস্ত্রোপচারের ঘরের ঠিক পাশেই। অনেকটা দূরে ছিল চাকরদের থাকার ঘর। ডাক্তার বেশির ভাগ দিন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করতেন।

অনেক রাতে চাকর-বাকরদের না ডেকে ডাক্তারের সঙ্গে রোগীদের যোগাযোগ করার সুবিধার জন্যে বাগানের দিকে একটা দরজা ছিল। আবার বাড়ির ভেতর থেকে অস্ত্রোপচারের ঘরের মধ্যে দিয়েও পড়ার ঘরে আসা যায়।

সোমবার রাত্রে মার্থা উডস ঢুকলেন ডাক্তারের পড়ার ঘরে। তখন উনি টেবিলের সামনে বসে ঝুঁকে কি যেন লিখছিলেন। সাড়ে নটা নাগাদ বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর মেরী ঘুমোতে চলে যায়। উনি রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত সংসারের এটা ওটা কাজ করেন।

হলঘরের দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজলো। মিসেস উডস ফিরে গেলেন নিজের ঘরে এবং বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

সবে তন্দ্রা এসেছে, হয়তো মিনিট পনেরো কুড়ি হবে, এমন সময় একটা চিৎকার শুনতে পেলেন। ঘরের মধ্যে না বাইরে থেকে আওয়াজটা এলো তা তিনি সঠিক বুঝতে পারলেন না। শব্দটা ভালো করে শোনার জন্যে কান পাতলেন। কিন্তু আর কিছু শুনতে পেলেন না। অথচ চিৎকারটা এমন উচ্চকিত এবং মর্মন্তুদ যে উনি নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। নাইটি পরেই তিনি ছুটে এলেন ডাক্তারের স্টাডি রুমে।

বৃদ্ধা ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিলেন। ভেতর থেকে শোনা গেল একটা কণ্ঠস্বর—কে ?

—স্যার আমি, মিসেস উডস।

—এখন কয়েকটা প্রয়োজনীয় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। আপনি বরং শুয়ে পড়ুন, কাল সকালে কথা বলবো।

মিসেস উডস হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। বুঝলেন তাঁর মনিব সুস্থই আছে এবং স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরেই কথা বললেন। কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরে একটু রুক্ষতার আভাস ছিল। তাই তিনি মনে মনে একটু কষ্ট পেলেন।

—স্যার, ভেবেছিলাম আপনি আমায় ডেকেছেন। তাই—

ভেতর থেকে উত্তর মিললো না। মিসেস উডস ফিরে এলেন। তখন ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা।

এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে এক মুদিখানা দোকানদারের স্ত্রী ডাক্তারকে ডাকতে এসেছিল। কোন সাড়া না পেয়ে ভাবলো এখনও রোগী দেখে ফিরে আসেন নি। মুদি বিশ্রী টাইফয়েডে ভুগছে। তাই তার স্ত্রী মিসেস ম্যাড্ডিং ডাক্তারের কাছে এসেছিল তারই নির্দেশে, কেমন থাকে জানানোর জন্যে। ডাক্তারকে না পেয়ে সে ফিরে এলো।

পেছনের দরজা থেকে একটা সরু পথ এঁকে বেঁকে চলে গেছে সদরদরজার দিকে, এখানে একটা ছোট লণ্ঠন জ্বলছিলো। সদর-দরজার কাছাকাছি পা রাখতেই মিসেস ম্যাড্ডিং লক্ষ্য করলো একজন লোক দ্রুতপায়ে ফটকের দিকেই এগিয়ে আসছে। ভাবলো, ডাক্তার কল থেকে ফিরে আসছেন, তাই ঐখানেই অপেক্ষা করতে লাগলো।

আগন্তুক যখন তার সামনা সামনি তখন তার ভুল ভাঙলো—ডাক্তার লানা নয়, গাঁয়ের তরুণ জমিদার মিস্টার আর্থার মর্টন। তাঁর হাবভাবে উত্তেজনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, হাতে বেশ ভারি একটা শিকারী চাবুক।

—ডাক্তারবাবু এখনও কল থেকে ফিরে আসেন নি স্যার। মিসেস ম্যাড্ডিং বললো।

—আপনি জানলেন কি করে ?

আর্থারের কণ্ঠে রুক্ষতার আভাস।

—আমি তাঁর কাছেই এসেছিলাম, অনেকবার কড়া নেড়ে সাড়া পাইনি।

—আলো জ্বলছে দেখছি। মিঃ মর্টনের কণ্ঠে অবিশ্বাস। আড় চোখে মিসেস ম্যাডিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, ওটাই তো ওঁর পড়ার ঘর, না ?

—হ্যাঁ স্যার। উনি যে ঘরে নেই আমি আপনাকে ঠিক জেনেই বলছি।

—বেশ তো, আবার আসবেন।

মিসেস ম্যাডিং কথা না বাড়িয়ে নিজের বাড়ির দিকে পা বাড়ালো। আর মিঃ মর্টন এগোলেন বাগানের সরু পথ ধরে।

রাত তিনটে নাগাদ মুদির অবস্থা খুব খারাপ দেখে স্ত্রী আর স্থির থাকতে পারেনি। সে ডাক্তারবাবুকে খবর দেওয়ার জন্যে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো। ফটক পেরোতে যাবে এমন সময় লক্ষ্য করলো লরেল ঝোপের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্বামীর ব্যাপারে বিশেষ উদ্বিগ্ন থাকায় মিসেস ম্যাডিং ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো না। তবে ওর ধারণা লোকটা মিস্টার আর্থার মর্টন ছাড়া কেউ নয়।

সে তড়িঘড়ি ছুটে গেল পড়ার ঘরের দিকে, তখনও আলো জ্বলছে। কড়া নাড়লো, সাড়া মিললো না। কয়েকবার দরজা ধাক্কা দিলো, তবুও ফল হলো না। ঘরে কেউ নেই অথচ তীব্র ভাবে আলো জ্বলছে—মিসেস ম্যাডিং-এর কেমন সন্দেহ হলো। নিশ্চয়ই ডাক্তার-বাবু পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সে চলে এলো বাগানে। ওদিকের জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলো। পর্দা দেওয়া ছিল, তবু ফাঁক দিয়ে লক্ষ্য করলো ঘরের সবকিছু।

ঘরের ঠিক মধ্যস্থলে বিরাট একটা টেবিল। একটা আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সবকিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা গেল, টেবিলের ওপর বই, ডাক্তারী যন্ত্রপাতি পড়ে রয়েছে।

একটা ময়লা দস্তানা পড়ে আছে গালচের ওপর। মিসেস ম্যাডিং-এর কেমন অস্বাভাবিক ঠেকলো।

ঠিক সেই মুহূর্তে সে লক্ষ্য করলো বুট সমেত একটা পা। ঘরের ঐ পাশটায় আলোর রশ্মি সম্পূর্ণ না পড়ায় অন্ধকার-অন্ধকার রয়েছে। মিসেস ম্যাডিং-এর দৃষ্টি ঐদিকে আকর্ষিত হলো। যেটাকে দস্তানা বলে মনে করেছিল সেটা আসলে মানুষের একটা হাত।

কি যেন এক অজানা আতঙ্কে মিসেসের সর্বশরীর থরথর করে কেঁপে উঠলো। নিশ্চয় কোন অঘটন ঘটেছে। তাই ছুটে এলো সামনের দরজায়—ঘণ্টা বাজালো।

বিপদ সংকেত শুনে মিসেস উডস বিছানা ছেড়ে চলে এলেন। মুদির বৌ-এর কাছে সব শুনে মেরীকে পাঠিয়ে দিলেন থানায় খবর দিতে।

পড়ার ঘরের জানালা থেকে খানিকটা দূরে, টেবিলের একপাশে দেখা গেলো ডাক্তার লানার মৃতদেহটা গালচের ওপর সটান পড়ে রয়েছে। তাঁর দেহে রয়েছে প্রচণ্ড আঘাতের ছাপ। কপালের একটা পাশ থেকে গলা পর্যন্ত কালসিটে পড়ে ফুলে উঠেছে, একটা চোখ ফুলে কালো হয়ে আছে। অন্যদিকে সামান্য একটু ফুলে ওঠা শরীর দেখে স্পষ্টই বোঝা গেলো শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয়েছে।

ডাক্তার লানা বোধহয় বাইরে বেরোচ্ছিলেন, তাই তাঁর পরনে দেখা গেলো বাইরের পোশাক। কাদা মাখা নোংরা বুটের দাগে গালচে ভর্তি। দরজার দিকে ছাপ আরো বেশি। পায়ের ছাপ লক্ষ্য করে বোঝা গেলো হত্যাকারী পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করেছিল। কাজ হাসিল করে ঐ পথেই পালিয়েছে। পায়ের ছাপের গঠন আর আঘাতের ভঙ্গিমা প্রমাণ করলো আততায়ী একজন পুরুষ। পুলিশ এছাড়া আর কোন ক্লু খুঁজে পেলো না। অতএব হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব।

ঘরের জিনিসপত্র যেখানকার সেখানেই রয়েছে। সোনার দামী

ঘড়ি ডাক্তারের পকেটেই আছে। তালা দেওয়া অবস্থায় টেবিলের ড্রয়ারে ছিল অনেক টাকা। কেবল একটা জিনিস খোয়া গিয়েছিল, তা হলো কুমারী মর্টনের একটা ছবি, টেবিলের ওপর রাখা ছিল। কে যেন ফ্রেম থেকে ছবিটা নিয়ে উধাও হয়েছে। সন্ধ্যেবেলায় যখন মিসেস উডস এঘরে ঢুকেছিলেন তখনও টেবিলের ওপর ছবিটা ছিল। মেঝে থেকে পাওয়া গেল চোখের ক্ষত ঢাকার একটা ঠুলি। মিসেস উডস পূর্বে এ জিনিস দেখেন নি। এই ধরনের ঠুলি সাধারণতঃ ডাক্তারদের কাছেই থাকে। কিন্তু ডাক্তার লানার কাছে ছিল না। এই হত্যার সঙ্গে ঐ ঠুলির কি সম্বন্ধ থাকতে পারে তা কারো বোধগম্য হলো না।

মিঃ আর্থার মর্টনকে কেন্দ্র করে সবার সন্দেহ গড়ে উঠলো। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করলো। ওঁর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল না। কিন্তু সমস্ত পারিপার্শ্বিকতা ওঁর বিপক্ষে। বোনকে ও ভীষণ ভালোবাসে। ডাক্তারের সঙ্গে বোনের মনোমালিন্য হওয়ার পর থেকে আর্থার উঠে পড়ে লেগেছিল ডাক্তারের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং প্রত্যেকের কাছে সেই রাগও প্রকাশ করতো।

এইসব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে পুলিশ মিঃ মর্টনের বিরুদ্ধে যে কেস খাড়া করলো তা হলো—শিকারী চাবুক হাতে নিয়ে মিঃ মর্টন রাত এগারোটা নাগাদ ডাক্তারের বাড়িতে যায়। ডাক্তার লানার সঙ্গে দেখা হয় এবং দুজনের মধ্যে বচসা শুরু হয়। ঐ সময় একটা ভয়ার্ত কিংবা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে মিসেস উডস ছুটে আসেন। কিন্তু যেহেতু তখন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি, হয়তো ডাক্তার ভেবেছিলেন আগন্তুকের সঙ্গে আর কিছুক্ষণ কথা বলবেন, তাই মিসেস উডসকে বিদায় জানিয়ে ছিলেন।

এই আলোচনা যে অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্রুদ্ধতা থেকে ক্রমশঃ ব্যক্তিগত আক্রোশের এমন একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায়, যেখানে ডাক্তারকে প্রাণ দিতে হলো।

খুন করার পর মিঃ মর্টন ফ্রেম থেকে খুলে নেন বোনের ছবিটা। যখন ফিরে যান তখন দেখা হয় মিসেস ম্যাডিং-এর সঙ্গে। গা ঢাকা দেওয়ার জন্য লরেল ঝোপে গিয়ে ঢোকে।

অন্যদিকে খুনের দায় থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে মিঃ মর্টনের পক্ষেও অনেক যুক্তি ছিল। গ্রামের সবাই তাকে ভালোবাসতো। তিনি ছিলেন দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। এমন জঘন্য কাজ মিঃ মর্টনের মত ভালো মানুষ কি করে করতে পারে? এ সম্পর্কে আর্থার বলেছেন—বিশেষ একটা পারিবারিক কারণে (তাঁর বক্তব্যের কোথাও বোনের নামটি উল্লেখ করেন নি) ডাক্তার লানার সঙ্গে উনি কথা বলতে চেয়েছিলেন। এবং মোটেও অস্বীকার করার চেষ্টা করেন নি যে আলোচনা হয়তো তিক্ততায় পরিণত হতে পারতো।

উনি ডাক্তারের বাড়িতে ঠিকই গিয়েছিলেন এবং সদর দরজায় এক রোগী মুখে জানতে পারলেন, ডাক্তার বাড়িতে নেই। তিনি রাত তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে আসেন। লানা যে মারা গেছে— এসব কিছুই তিনি জানতেন না। পুলিশ ওঁকে গ্রেফতার না করলে কিছুই হয়তো জানতেন না। একসময় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে ওঁর যথেষ্টই অন্তরঙ্গতা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি একটা কারণে ঐ সম্পর্কে ভাঁটা পড়ে।

ঘটনার বিবরণেও এমন কতকগুলো ইঙ্গিত আছে যা আর্থার মর্টনের নির্দোষিতাকেই সমর্থন করে। রাত সাড়ে এগারোটার সময় ডাক্তার লানা যে তাঁর পড়ার ঘরে জীবিত অবস্থায় ছিলেন, তা খাঁটি সত্যি। কেননা মিসেস উডস ঐ সময়ে তাঁর মনিবের কণ্ঠস্বর স্বকর্ণে শুনেছেন।

আর্থারের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা মনে করে যে ডাক্তার লানা সে সময়ে ঘরে একলা ছিলেন না এবং মনিবের রুক্ষ উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরই ওদের এই বক্তব্যকে সমর্থন করে। যদি তাই হয়, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই ধরে নিতে হবে যে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে মিসেস ম্যাডিং যখন প্রথম ডাক্তারকে ডাকতে এসে কোন সাড়াশব্দ পায়নি, সেই সময়ের মধ্যেই

মৃত্যু ঘটেছে। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই আর্থার মর্টনকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, মিসেস ম্যাডিং ফিরে যাবার সময়েই তরুণ জমিদারটিকে প্রথম ফটকের সামনে দেখতে পায়।

যদি তাই ধরে নেওয়া হয় অর্থাৎ মিসেস ম্যাডিং-এর সঙ্গে মিঃ মর্টনের দেখা হওয়ার আগেই কেউ একজন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি কে ? এবং তার দেখা করার কারণ কি ?

দোষী ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য তার বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বরং ঐ নির্দিষ্ট রাতে মর্টনকে ডাক্তারের বাড়িতে চঞ্চল মনে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে।

আবার এমনও হতে পারে—মিসেস উডসকে ঘরে ফিরে যেতে বলে ডাক্তার বাইরে বেরিয়ে যান। তাই মিসেস ম্যাডিং তাঁর দেখা পায়নি। যখন ডাক্তার বাড়ি ফিরে আসেন তখন আর্থারের সঙ্গে দেখা হয়। বন্ধুরা অভিযোগ তুলেছিল, ফ্রান্সিসের ছবিটা মর্টন নিয়ে আসেনি। কিন্তু এ যুক্তি গ্রাহ্য হলো না। কেননা ছবি চুরি করে ওটা পুড়িয়ে ফেলার বা নষ্ট করার যথেষ্ট সময় পেয়েছিল চোর।

এ ঘটনার একটাই মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে যা খুব সহজেই আবিষ্কার করা যেতো—কাদা মাখা বুটের ছাপ। কিন্তু গালচেটা অতিরিক্ত নরম থাকায় ঐ যুক্তি খাটে নি। নিঃসন্দেহে আর্থারের বুটে যথেষ্ট কাদা লেগেছিল, তবে সেদিন সন্ধ্যেবেলায় যা ভীষণ বৃষ্টি হয়েছিল, তাতে যে কোন লোকের বুটে কাদা লাগা অসম্ভব নয়।

প্রেমকে কেন্দ্র করে একদিকে ঘটনাটা যেমন সত্যিই ভারি অদ্ভুত, অন্যদিকে পরস্পরের বক্তব্য তেমনি খুবই অসংলগ্ন। ডাক্তার লানার পূর্বপরিচয় সবার জানা না থাকলেও, তাঁর বর্তমান সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবহার সবাইকে মোহিত করতো। অপরদিকে যে ব্যক্তিকে দোষী করা হয়েছে সে-ও সকলের প্রিয় পাত্র। অতএব ব্যাপারটা বিশপস্ ক্রসিং-এর বাসিন্দাদের ভীষণ ভাবে কৌতূহলী করে তুললো।

এসম্পর্কে ল্যাংকাস্টার উইকলিতে প্রচুর লেখালেখি হলো। মামলা শুরু হলো।

বিচারের প্রথম দিন। আদালতে সৃষ্টি হয়েছে চাঞ্চল্যকর পরিবেশ।

আসামী পক্ষের উকিল মিঃ পরলক কার তাঁর পেশানুযায়ী সমস্ত ঘটনাকে সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফরিয়াদী পক্ষের মিঃ হ্যাম্পরের যুক্তিপূর্ণ কথার সামনে তাঁর কোন কথা টিঁকলো না। আর্থার মর্টনের বিরুদ্ধে কয়েকজন সাক্ষী দিলো—অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় আর্থার মর্টন ডাক্তার লানাকে শাসিয়ে ছিল।

এবার সাক্ষী দিলো মিসেস ম্যাডিং, ঘটনার শুরু থেকে সে যা বলছিল, সেকথাই আবার বললো—গভীর রাতে আসামীকে সে ডাক্তারের বাড়ির সামনে দেখেছে।

অন্য একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে জানা গেল—বাইরের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত যে ডাক্তার পড়াশুনা করতেন তা আর্থার মর্টনের জানা ছিল। একা পাবার সুযোগ নেবে বলে ঐ সময়ও গিয়েছিল।

আর্থার মর্টনের বহুদিনের পুরনো চাকর ভয়ে ভয়ে বললো যে তার মনিব রাত তিনটে নাগাদ বাড়ি ফিরেছে। এক্ষেত্রে মিসেস ম্যাডিং-এর কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হলো। কেননা ঠিক ঐ সময়ে লরেল ঝোপের মধ্যে আর্থার মর্টনকে লুকিয়ে থাকতে দেখেছিলো সে।

গালচের ওপর যে কাদামাখা বুটের ছাপ পাওয়া গেছে, মিঃ মর্টনের বুটের ছাপের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। এক্ষেত্রে আসামীর বিরুদ্ধে যখন সবরকম যুক্তি সত্য বলে প্রমাণিত হলো তখন কোন অলৌকিক বা অপ্রত্যাশিত একটা কিছু না ঘটলে আসামীর মুক্তি অসম্ভব।

বিরতির পর সাড়ে চারটে নাগাদ আবার বিচার শুরু হলো।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়ালেন কুমারী ফ্রান্সিস মর্টন, বাদীপক্ষের প্রথম সাক্ষী। সঙ্গে সঙ্গে বিচারকক্ষ গম গম করে উঠলো। তাদের প্রত্যেকের দৃষ্টি এসে পড়লো সাক্ষীর ওপর। ফ্রান্সিস কি বলবে তা শোনার জন্য আদালতের উপস্থিত সকলে উৎকীর্ণ হয়ে আছে। এই

বিশ্রী ঘটনার সঙ্গে যে কুমারী মর্টন জড়িয়ে পড়বেন তা কেউ ভাবে নি। পুলিশ বা আদালত কেউই ওঁকে প্রত্যক্ষভাবে এ মামলায় জড়ায়নি। তবু ফরিয়াদী পক্ষের প্রধান সাক্ষী হিসেবে ওঁর উপস্থিতিতে সকলে হতবাক হয়ে গেল।

কুমারী ফ্রান্সিসের দীর্ঘাঙ্গী রূপসী চেহারার সঙ্গে আগেই পরিচয় করিয়ে দিয়েছি। খুব নীচু অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে তিনি সাক্ষী দিলেন। একটা চাপা আবেগ তাঁকে বার বার বিরক্ত করে। তিনি নিজেকে সংযত করে সংক্ষেপে জানালেন ডাক্তার লানার সঙ্গে তাঁর বাগদানের কথা। একটা অত্যন্ত জরুরী কারণে বাগদান ভেঙে যায়। কিন্তু কারণটা তিনি প্রকাশ করতে রাজী নন।

তবে এ প্রসঙ্গে তিনি পরিষ্কার জানিয়েছেন, যা শুনে আদালতের প্রত্যেকে বিস্মিত হয়েছে তা হলো ডাক্তার লানার প্রতি আর্থারের ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠাটা খুবই অন্যায়, অযৌক্তিক ও অপমানকর।

বিরোধী পক্ষের উকিল জানতে চাইলো, কি কারণে আর্থার মর্টন ডাক্তারের ওপর অসন্তুষ্ট হন? এ প্রশ্নের জবাবে কুমারী মর্টন জানান, উত্তর তাঁর অজানা। ডাক্তার লানা একজন অত্যন্ত সম্মানীয় ব্যক্তি। তার সঙ্গে সর্বদা ভালো ব্যবহার করেছেন। উপরন্ত বলা যায়, ব্যাপারটা ভালো ভাবে না জেনে আর্থারই লানার ওপর দুর্ব্যবহার করেছে। ওর ওপর প্রতিশোধ নেবে বলে শাসিয়েছে। কুমারী মর্টনের কোন উপরোধ-মিনতি গ্রাহ্য করেন নি। এমন কি সেদিন সন্ধ্যে বেলায় সদর্পে হুমকি দিয়েছেন—আজই এর একটা বিহিত করে তবে অন্য কথা।

পারিবারিক সম্মানের ব্যাপারে আর্থার এমন অসম্ভব একগুঁয়ে যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও ফ্রান্সিস ওকে ফেরাতে পারে নি।

এই পর্যন্ত মিস মর্টনের সাক্ষ্য প্রমাণ আসামীর স্বপক্ষে না গিয়ে বরং ওর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলোকে আরও সুদৃঢ়ই করেছে। কিন্তু পরক্ষণেই মিষ্টার হ্যাম্পার সওয়ালের জবাবে এমন অপ্রত্যাশিত তথ্য প্রকাশ পেলো, যার আলোকে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যদিকে ঘুরে গেল।

মিঃ হ্যাম্পরে—আপনি কি বিশ্বাস করেন আপনার ভাই এ ঘটনায় অপরাধী ?

বিচারক—মিষ্টার হ্যাম্পরে, এ ধরনের প্রশ্ন করার অনুমতি নেই। বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য এখানে আসেননি, এসেছেন ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে।

মিঃ হ্যাম্পরে—আপনি কি জানেন, ডাক্তার লানার মৃত্যুর জন্য আপনার ভাই দায়ী নয় ?

কুমারী মর্টন—জানি।

মিঃ হ্যাম্পরে—কি করে সম্ভব হলো ?

কুমারী মর্টন—কারণ ডাক্তার লানা জলজ্যান্ত বেঁচে আছেন।

মুহূর্তের মধ্যে বিচারকক্ষে শুরু হয়ে গেল কোলাহল। প্রত্যেকের চোখে মুখে উত্তেজনা, ব্যাপার কি ? এরজন্য বিচারের কাজ কিছুক্ষণ বন্ধ রাখতে হলো।

আবার ডাক্তারের পক্ষে উপদেষ্টা বললেন—ডাক্তার লানা যে বেঁচে আছেন, আপনি কি করে জানলেন মিস মর্টন ?

যেদিন ও মারা গেল অর্থাৎ মৃত বলে ঘোষিত হলো তারপরের দিন ও আমাকে একটা চিঠি দেয়।

—চিঠিটা কি আপনার কাছে ?

—হ্যাঁ। কিন্তু ওটা কাউকে দেখাতে চাই না।

—খামটা আপনার কাছে ?

—হ্যাঁ।

—কোন্ পোস্টঅফিস থেকে চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে ?

—লিভারপুল।

—তারিখ ?

—২২শে জুন।

—তার মানে দুর্ঘটনার পরের দিন। আচ্ছা, আপনি কি ঐ

হাতের লেখা সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ? অর্থাৎ ওটা কি ডাক্তার লানার লেখা চিঠি।

—হ্যাঁ। সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

—ধর্মাবতার, ডাক্তার লানার হাতের লেখার সত্যতা নিরূপণের জন্যে আমি আরো ছজন সাক্ষীকে হাজির করতে চাই।

বিচারক রায় দিলেন—বেশ, কাল তাদের বিচারসভায় হাজির করবেন।

আসামী পক্ষের উকিল মিঃ পরলক কার বললেন—হুজুর, ছজন সাক্ষীকে হাজির করার আগে আমি চাই ঐ ব্যক্তির অর্থাৎ যাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে তার হাতের লেখা আমার বিশেষজ্ঞকে দিয়ে একবার জরীপ করাতে। তাই প্রমাণপত্রটা দাখিলের অনুমতি চাইছি ধর্মাবতার।

আশা করি না বললেও চলবে যে এই অপ্রত্যাশিত তথ্যের ফলে অন্ততঃ এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং অনুসন্ধানের সমস্ত পদ্ধতিটাই ভিন্নমুখী করে তুলেছে। তবু একটা প্রশ্নে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারছি না হুজুর—কুমারী মর্টনের বিবৃতি যদি সত্যি বলে ধরে নিই তাহলে উনি চিঠিটা পেয়েছিলেন দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরের দিন, অর্থাৎ আজ থেকে বেশ কয়েকদিন আগে। এর ভাইকে ওঁর অপরাধী বলে ধরা হয়েছে, পুলিশ চালিয়েছে জোর অনুসন্ধান, এমন কি করোনারের বিচারও চলছে। কিন্তু সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার, মিস মর্টনের এক্তিয়ারে এমন একটা উল্লেখযোগ্য প্রমাণ থাকবে, যা দিয়ে উনি সমস্ত ব্যাপারটা থামিয়ে দিতে পারেন, অথচ উনি তা প্রকাশ করেন নি। অর্থাৎ উনি চেয়েছিলেন, এই নিয়মমাফিক পদ্ধতি চলুক।

মিঃ হ্যাম্পরে প্রশ্ন করলেন—মিস মর্টন, এই যুক্তির ব্যাখ্যা কি দেতে পারেন ?

—ডাক্তার লানার নির্দেশে আমি এই গোপনীয়তা রক্ষা করতে বাধ্য হয়েছি।

—তাহলে আপনি এ কথা ফাঁস করলেন কেন ?

মিঃ কার-এর প্রশ্নে ফ্রান্সিস মর্টন বললেন—আমার ভাইকে বাঁচাতে।

আবার মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল উপস্থিত জনতার মধ্যে। বিচারপতির নির্দেশে সবাই আবার শান্ত হলো।

বিচারক বললেন—আত্মপক্ষ সমর্থনের এই প্রয়াসকে আমি অভি-নন্দন জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে মিঃ হ্যাম্পরে আপনাকে অনুরোধ করবো, এতগুলো লোক, বিশেষ করে যারা ডাক্তারের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছে—বন্ধুবান্ধব, চাকর বাকর যাকে ডাক্তার লানা বলে ভুল করলেন, আসলে সেই মৃতদেহটা কার, সে সম্পর্কে কিছু জানার জন্য।

—হুজুর, আপনার নির্দেশে ঐ মৃতদেহের ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারবো বলে আশা রাখি।

—বেশ, তাহলে বিচার আজকের মত এখানেই শেষ। কাল সকালে আবার আদালত:বসবে।

* * *

'কালো ডাক্তারের' ঘটনার নতুন পরিস্থিতি জনসাধারণের কৌতূহলকে নিয়ে গেল উত্তুঙ্গ চূড়ায়। গ্রামের এদিক ওদিক শোনা গেল নানা রটনা, প্রৌরদের জটলা, একটা ভীষণ আলোড়ন স্বষ্টি করলো।

কানাঘুঁযো শোনা গেল—দূর ওসব বাজে কথা। আসলে কুমারী মর্টন তার ভাইকে বাঁচানোর জন্য এই ফন্দি এঁটেছে। যদিও বা এ যুক্তি মেনে নেওয়া যায়, মানে ডাক্তার লানা জীবিত আছেন তাহলে মামলা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দোষী সাব্যস্ত হবেন স্বয়ং ডাক্তার, কারণ তাঁর পড়ার ঘরে যে অপরিচিত লোকের মৃতদেহটা পাওয়া গেছে, যার সঙ্গে ডাক্তার লানার চেহারার অপূর্ব সাদৃশ্য রয়েছে, তার মৃত্যুর জন্যে ডাক্তারকেই খুনী হিসেবে ধরা হবে।

তাছাড়া কুমারী মর্টন যে ডাক্তার লানার কাছ থেকে পাওয়া চিঠি আদালতে দায়ের করলো তা দেখাতে রাজী হলো না। এর কারণ একটাই। তার জন্যে পূর্ব প্রেমিকের সঙ্গে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে তাকেও জড়িয়ে পড়তে হবে। তখন ভাইয়ের গলায় ফাঁসির দড়ি না ঝুলে ওর গলাতেই ঝুলবে।

পরের দিন সকালে আদালত কক্ষে লোকের ভীড় ক্রমশ বাড়তে লাগলো। এমন একটা রোমাঞ্চকর ঘটনার জল কোথায় গিয়ে গড়ায় তা দেখার জন্যে সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

বিচারের কাজ তখনও শুরু হয়নি। দুই পক্ষের উকিল নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করলেন, বিচারক প্রবেশ করলেন। সবাই উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলো। সবাই নীরব।

বিচারকের কণ্ঠস্বরে আদালত কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো। তিনি নির্দেশ দিলেন—মিঃ হ্যাম্পরে; সাক্ষ্য গ্রহণের ব্যাপারটা আজই মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন।

—আপনার নির্দেশ মতই কাজ করবো হুজুর। আশা করি দ্বিতীয় সাক্ষীই এই রহস্যের সমাধান করতে যথেষ্ট সাহায্য করবে। মিঃ হ্যাম্পর বিনীত কণ্ঠে বললেন।

—আমি তাঁকেই ডাকার অনুমতি দিচ্ছি।

—ডাক্তার অ্যালোইসিয়াস লানাকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মিঃ হ্যাম্পরের কথাগুলো শুনে দর্শকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। এমন কি নামটা শুনে বিচারক মশাই পর্যন্ত হকচকিয়ে গেলেন। জীবনে বহু বিচিত্র ঘটনার নীরব সাক্ষী তিনি, তবু যাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জটিল এক রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে তাঁকে সশরীরে সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়াতে দেখে তিনি বড় বড় চোখে তাকিয়ে রইলেন।

দর্শকদের হাজার হাজার চক্ষু ঐ একই দিকে আবদ্ধ। তারা দেখলো বিশপস ক্রসিং-এর কালো ডাক্তার নামে পরিচিত ভদ্রলোকটি

তাঁর দীর্ঘ ঋজু চেহারা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখের বিষণ্ণ ভাব, যদিও স্পষ্ট নয় তবু কারো দৃষ্টি এড়ালো না। প্রতিভাদীপ্ত চেহারায় ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ পৌরুষ। কালো কুচকুচে চোখের মনি ছুটো চকচক করছে। এক কথায় বলা যায় ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ এবং শ'য়ে একটা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

বিচারককে অভিবাদন জানালেন অত্যন্ত শোভন ভঙ্গিতে। কিছু বক্তব্য পেশ করার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বিচারক ছুটি সর্তে তাঁকে অনুমতি দিতে রাজী হলেন। এক, তাঁর বিবৃতির প্রতিটি শব্দ নোট করা হবে, ছুই, দরকার হলে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা হবে। ডাক্তার শর্ত মেনে নিয়ে আবার বিচারকের উদ্দেশ্যে অভিবাদন জানালেন।

তিনি খুব নিম্ন কণ্ঠে অথচ স্পষ্ট ভাষায় শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য—

গত একুশে জুনের রাত্রে যা যা ঘটেছিল আমি তা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, এর মধ্যে কোথাও থাকবে না এতুটুকু ফাঁক বা মিথ্যে। আপনাদের সামনে আমার হাজির হওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু অনেক কিছু ভেবে আমি এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। গোপন সূত্রে জানতে পেরেছি আমার জন্যে একজন নিরপরাধী কষ্ট পাচ্ছে, এমন কি এই পৃথিবীর যাকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি তাকেও অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হচ্ছে। এর জন্যে আমিই দায়ী।

...হুজুর; আপনি হয়তো বলবেন, আমার আরো আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু বিশ্বাস করুন কয়েকটা কারণে এই ঘটনার কোন কিছুই আমি শুনতে পাইনি। কল্পনা করতে পারেনি এই ঘটনার আঁচ গিয়ে স্পর্শ করবে মিস্টার আর্থার মর্টনকে। যাক, আমি জানি, আমার কর্মের ফল আমাকেই ভোগ করতে হবে। ব্যাপারটা আপনাদের পরিষ্কার করে বোঝার জন্যে শুরু থেকেই বলছি।

...আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস আপনাদের নিশ্চয়ই কম-বেশি করে প্রত্যেকেরই জানা আছে। লানাদের নাম তাদের অজানা নেই।

বহু স্মৃতি বিজড়িত অত্যন্ত প্রাচীন একটা স্প্যানিশ বংশের ছেলে আমি। আমার শরীরে বইছে সেইসব বংশধরদের উষ্ণ রক্ত, রাষ্ট্রের খুব বড় একজন অফিসার ছিলেন আমার বাবা, এমনকি রাষ্ট্রপতি পদেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সান জুয়ানের এক লড়াইয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বাবা যদি হঠাৎ ওভাবে না মরতেন তাহলে আমার যমজ ভাই এরনেস্ত আর আমার ভবিষ্যৎ হয়ে উঠতো আরো উজ্জ্বল। জীবিকা নির্বাহের জন্যে আমাকে তাহলে অত চিন্তা করতে হতো না।

···হুজুর, আপনি হয়তো ভাবছেন এমন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে আমি কেবল সময় নষ্ট করছি। কিন্তু না, এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হলে এইটুকু ভূমিকা গ্রহণ করতেই হবে। আপনার কাছে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

···আমার যমজ ভাই এরনেস্ত আর আমার চেহারার মধ্যে ছিল অপূর্ব সাদৃশ্য। আমাদের দুজনকে আলাদা করে চেনা ছিল দুস্কর। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আকৃতির কোন হেরফের হলো না। কেবল পাল্টালো আমাদের অভিব্যক্তি। তবে চরিত্রের দিক থেকে একটা পার্থক্য ছিল ঠিকই। তা একমাত্র জানা সম্ভব হতো তাদেরই যারা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করেছে।

···ওর স্বভাব চরিত্র ছিল অতি ভয়ঙ্কর। যা দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠতাম। এমনকি সম্ভব হলে ওর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতাম না। ওর বিশ্রী ব্যবহারের জন্যে আমাকে খোয়াতে হতো মান-সম্মান। এরনেস্ত জানতো আমার এই দুর্বলতার কথা। সে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লো না। ওর কলঙ্কিত জীবনের যা কিছু আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতো। আমি ওর দুর্ব্যবহারে মরিয়া হয়ে উঠলাম। অবস্থা একদিন এমন চরমে গিয়ে উঠলো যে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসা ছাড়া আমার কোন বাঁচার পথ রইলো না। তাই অগত্যা চলে এলাম এই ছোট্ট গ্রাম বিশপস ক্রসিং-এ। এমন কি

পিতৃপুরুষের পরিচয় পর্যন্ত দিলাম না কারো কাছে। ভাবলাম এমন অখ্যাত নির্জন গ্রামে ও আর আমার খোঁজ পাবে না।

আত্মগোপন করে কাটালাম বেশ কয়েক বছর এবং শান্তিতেই। কিন্তু আমার সুখী জীবনে একদিন হঠাৎ উদ্ভাসিত হলো সেই কালো মেঘটা। ও আমার ঠিকানা খুঁজে বের করলো। সম্ভবতঃ বুয়েনস এরিসে বেড়াতে যাওয়ায় লিভারপুলের কোন ভদ্রলোকই আমার সন্ধান ওকে দিয়ে থাকবে। তখন ও সবকিছু উড়িয়ে খেয়ে বসে আছে শূন্য হাতে। ভাবলো, আমার কাছে এসে আবার ভাগ বসাবে। ওর দৃঢ় ধারণা, ওর যে কোন অন্যায় আব্দার আমি মেনে নিতে বাধ্য হবো।

ওর একটা চিঠি পেলাম। জানালো খুব শীগগিরই আমার কাছে আসছে। ওর আগমন বার্তা পড়ে আমি আতঙ্কিত হলাম। নিজের ব্যাপার নিয়ে আমি একটু চিন্তিত ছিলাম। তার ওপর এই উৎপাত আমাকে একেবারে পাগল করে তুললো। না জানি কি এক নতুন ঝামেলায় জড়িয়ে ও আমার সর্বনাশ করে বসবে। তখন আমার মনে একটা চিন্তাই ঘুরপাক করতে লাগলো—অশুভ যাই ঘটুক না কেন, তা কেবল আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক, কুমারী মর্টন বা তার পরিবারের গায়ে যেন তাপ না লাগে। এর জন্য আমি সবরকম চেষ্টা করলাম।

চিঠিটা যখন আমার মনোভাবকে এমন পরিস্থিতিতে হাজির করেছে তার কয়েকদিন পর একদিন রাত্রে এসে হাজির হলো এরনেস্ত। তখন চাকর-বাকররা ঘুমিয়ে আছে। পড়ার ঘরে নিজে বইপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছি—এমন সময়ে বাইরের নুড়ি বিছানো পথে কার পদধ্বনি শুনে সচকিত হলাম। ইতিমধ্যে বাইরের আগন্তুক জানালা দিয়ে উঁকি মেরেছে। আমি তাকালাম। আমার ভাই এরনেস্ত একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার মত তারও দাড়ি-গোঁফ কামানো। এরনেস্ত বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মুচকি হাসলো। ওর এই হাসিটা আমার অচেনা নয়। মনে পড়ে গেল সেই কথা। দেশ থেকে আমাকে তাড়িয়েছে ওর ঐ সর্বনাশা বিশ্রী হাসি।

…ওসব ভাবনা দূরে ঠেলে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। ভেতরে ওকে আসতে বললাম। তখন রাত সাড়ে দশটা হবে।

…ঘরে উজ্জ্বল আলোয় ওর আপাদমস্তক ভালো করে লক্ষ্য করে চমকে উঠলাম। চোখে মুখে চরম দারিদ্র্যতার ছাপ সুস্পষ্ট। লিভার-পুল থেকে দীর্ঘ দশ মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসে ও তখন কাহিল হয়ে পড়েছে। আমি মনে মনে ভীত হলাম। আমার অভিজ্ঞ ডাক্তারী চোখ বলে দিলো—চরম দারিদ্র্য, অত্যধিক মদ্যপান, আভ্যন্তরীণ কোন কঠিন অসুখে এবং দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় ক্লান্তিতে এরনেস্ত তখন সম্পূর্ণ-ভাবে মুমূর্ষু। একটা চোখ ফুলে ঢোল হয়ে আছে—নাবিকদের সঙ্গে মারপিট করার নমুনা আর কি !

…ও ওর চোখের ওপর থেকে খুলে রাখলো সবুজ ঠুলিটা। ঠিক সেই মুহূর্তে ওর অন্য চোখটা প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলো। ওর ঐ হিংস্র চোখের ভাষা আমার উপর পড়তে দেরী হলো না—তুমি ইংল্যাণ্ডে বসে টাকার পাহাড় বানাচ্ছো আর আমি আমেরিকায় না খেয়ে চচ্চড়ি হচ্ছি।

…অকথ্য ভাষায় ও আমাকে গালাগাল দিলো। আমাকে যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করলো। আসলে আমি জানি, কঠিন দারিদ্র্য এবং বিরামহীন লম্পটের জন্যে ওর মাথাটাই বিগড়ে গিয়েছিল। আমার কাছে দাবী করলো টাকা দিতে হবে, মদ চাইলো, সারা ঘরময় অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে পায়চারি করতে লাগলো।

…আমারও মেজাজ যখন তখন বিগড়ে যায়, কারণ স্প্যানিশ বংশধরদের রক্ত তো আমার শরীরেও রয়েছে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে আমি একটুও উত্তেজিত হইনি। এজন্য ঈশ্বরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। নীরবে বসে ছিলাম মাত্র। আমার অসীম ধৈর্য এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

…সম্ভবতঃ আমার নীরবতা তাকে আরো করে তুললো উত্যক্ত। হিংস্র পশুর মত গর্জন করতে করতে ঘুঁষি পাকিয়ে তেড়ে এলো আমার দিকে। কিন্তু আমাকে আঘাত করার অবকাশ পেলো না।

লক্ষ্য করলাম বুকটা সে দুহাতে আঁকড়ে ধরেছে। ক্ষীণ কণ্ঠে একবার কঁকিয়ে উঠে ধপ করে বসে পড়লো মাটিতে। তারপরেই বিরাট এক আর্তচীৎকারে ঘর গম-গম করে উঠলো। আমি দ্রুতহাতে ওকে তুলে সোফায় শুইয়ে দিলাম। ততক্ষণে ওর প্রাণবায়ুটুকু বেরিয়ে গেছে। ওর দুর্বল ভগ্ন হৃদয় ওকে একেবারে কুঁরে কুঁড়ে শেষ করে দিয়েছিল। নিজের প্রচণ্ড উত্তেজনাই ওর মৃত্যুর কারণ হলো।

ভাইয়ের এমন অভাবনীয় মৃত্যুতে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে সচকিত হলাম। সম্ভবতঃ এরনেস্তের আর্তচীৎকারে মিসেস উডসের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। খোঁজ নিতে এলে আমি তাকে দরজার বাইরে থেকেই বিদায় জানালাম। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজায় টোকার শব্দ শুনলাম। মনে হয় কোন রুগী এসেছিল। সাড়া দিলাম না। অতএব সে ফিরে গেলো। এবার ভাইয়ের মৃতদেহ নিয়ে ভাবনায় পড়লাম। ক্ষণিকের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিকল্পনাও গ্রহণ করে ফেললাম। হুজুর, সত্যি বলতে বাধা নেই, ঐ সময় পরিস্থিতির ফলাফল ভাবার মত অবকাশ ছিল না।

···এরনেস্তর চিঠি পাবার পর থেকেই বার বার ভেবেছি, কাউকে কিছু না জানিয়ে বিশপস্ ক্রসিং থেকে বিদায় নেবো। কিন্তু যতবারই এগিয়েছি, ততবারই একজনের কলঙ্কের কথা ভেবে পিছিয়ে এসেছি। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যার জন্যে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি, তার মৃতদেহ আমার ঘরে আবিষ্কৃত হলে সেই কলঙ্ক থেকে আমি কিছুতেই রেহাই পাবো না। তাই কেবল একটা ভাবনাই আমাকে পেয়ে বসেছিল—যে ভাবেই হোক আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে এবং এই মুহূর্তে।

···মৃত ভাইয়ের ফোলা চোখ আর মুখে সামান্য রুক্ষতার ছাপ ছাড়া আমার সঙ্গে কোন অমিল নেই। বিশপস্ ক্রসিং-এ ওকে কেউ আসতে দেখেনি। অতএব পোশাক পাল্টে নিলেই চলবে। সবাই জানবে, ডাক্তার লানাই মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন তাঁর পড়ার ঘরে।

অতএব পোশাক অদল-বদল করে সেই রাত্রিতেই বেরিয়ে পড়লাম পথে। পায়ে হেঁটে হাজির হলাম লিভারপুল বন্দরে। আসার সময় একটা জিনিস নিয়ে এসেছিলাম, তা হলো মিস্ মর্টনের ছবি। কিন্তু তাড়াহুড়োর ফলে ভাইয়ের চোখের ঠুলিটা নিয়ে আসতে পারি নি।

...নতুন করে বাঁচার আকাঙ্ক্ষা আমাকে ভীষণভাবে তাগাদা দিচ্ছিল। কিন্তু কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার জন্যে কেউ জড়িয়ে পড়বে বিশ্রী জালে, আমাকে লোকে খুনী বলবে। লিভারপুল থেকে কোরান্না গামী একটা জাহাজে আসন সংরক্ষিত করলাম। কারণ ভেবেছিলাম কয়েকদিনের ঘোরাফেরায় মন কিছুটা শান্ত হবে। সেই সঙ্গে ভবিষ্যতে কি করবো তা-ও ঠিক করে ফেলতে পারবো।

...কিন্তু জাহাজে চড়া আমার আর হলো না। মনে পড়ে গেল একজনের কথা যে আমার মন-প্রাণ জুড়ে আসন পেতে বসে আছে। এ পৃথিবীতে সেই একজন, আত্মীয়স্বজনরা ওর প্রতি যত নির্মম ব্যবহার করুক না কেন, কিন্তু আমার জন্যে ওর মনে বিষণ্ণতার ছায়া নামবে, ও কষ্ট পাবে—এসব অনুমান করে আমি নিজেকে কিছুতেই সুখী করতে পারবো না। অবশ্য আমার এই ছলনার উদ্দেশ্য ফ্রান্সিস বুঝতে পেরেছিল, কিন্তু ও তাকে ঘৃণা করেনি। মর্টন পরিবার আমার ওপর তিক্ত হলেও ফ্রান্সিস আমাকে কোনদিন ভুলতো না।

...তাই সিত্থর করলাম ওকে চিঠি দিতো। সব কিছু জানাতো। করলামও তাই। চিঠির গোপনীয়তা রাখার জন্যে ওকে অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু পারিপার্শিক চাপে ও আমার নির্দেশ মানতে পারেনি বলে আমার দুঃখ নেই। ওর ওপর আছে আমার অসীম আস্থা।

...বিশ্বাস করুন, সন্ধ্যাবেলার কাগজে আদালতের বিস্তারিত বিবরণ না পড়লে আমি জানতে পারতাম না যে ডাক্তার লানা বলে ধরে নেওয়া ব্যক্তির মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে এত হৈ-চৈ হচ্ছে, মিস্টার আর্থার মর্টনকে সেই মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হয়েছে। কাগজ পত্রে

সেই মুহূর্তে স্থির করলাম, আদালতে নিজে গিয়েই হাজির হবো। সমস্ত ঘটনা নিজের মুখে বলবো। তাই ভোরের এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে সোজা এখানে চলে এসেছি। হুজুর, এখানেই আমার বক্তব্য শেষ।

বিস্তৃত বিবরণ শুনে দর্শকরা স্তব্ধ হয়ে গেল। আদালত নীরব। একটা পিন পড়লেও বুঝি আওয়াজ পাওয়া যাবে।

ডাক্তার অ্যালোইসিয়াস লানার এই দুর্লভ বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করেই বিচার ভেস্তে দেওয়া হলো। ডাক্তার লানার কথার সত্যতা যাচাই করা হলো। যে জাহাজে চড়ে এরনেস্ত আর্জেন্টিনা থেকে এসেছিল, সেই জাহাজের ডাক্তারের কাছ থেকে জানা গেল, এরনেস্তের বুকের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ডাক্তার লানা ওর মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবরণ দিয়েছেন সেই ভাবে অস্বাভাবিক কিছু নয়। এছাড়া ডাক্তার এটাও জানালেন যে এরনেস্ত ছিল বদমেজাজী। যখন-তখন বিনা কারণে নাবিকদের সঙ্গে দাঙ্গা বাঁধানো তার স্বভাব ছিল।

বিশপস ক্রসিং-এর সেই বাড়িতে আবার ফিরে গেলেন ডাক্তার লানা। মিঃ মর্টনের সঙ্গে আবার তাঁর ভাব হলো। বিখ্যাত সংবাদ-পত্র 'মর্নিং পোস্ট'-এ একদিন সবাই দেখলো বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বিশপস ক্রসিং-এর পুরনো গির্জায় রেভারেণ্ড স্টিফেন জনসনের পৌরহিত্যে আর্জেন্টিনা প্রজাতন্ত্রের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী স্বর্গত ডন আলফ্রোদো লানার পুত্র ডাক্তার অ্যালোইসিয়াস লানার সঙ্গে ল্যাঙ্কশায়ার বিশপস ক্রসিং-এর জমিদার স্বর্গত জেমস মর্টনের একমাত্র কন্যা ফ্রান্সিস মর্টনের সঙ্গে শুভবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

[দুই]

১৮৯৬ সালের শীতের সকাল। একটা চিঠি পেলাম। হোমস খুব তাড়াতাড়ি লিখে পাঠিয়েছে—"ওয়াটসন, তুমি এখুনি চলে এসো।

আমি দ্রুত পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোমসের বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে এসে হাজির হলাম।

ঘরে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। দেখি চেয়ারে বসে হোমস আপন মনে ধুমপান করছেন, ধোঁয়ায় ঘর ভরে গেছে। তাঁর সামনের চেয়ারে বসে রয়েছেন মোটাসোটা ভারিক্কী চেহারার এক প্রৌঢ়া।

আমাকে দেখে হোমস উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন—এসো ওয়াটসন, এসো। এসো মিসেস মেরিলোর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। না না, সিগারেট নেভাতে হবে না। উনি কিছু মনে করবেন না। ইনি দক্ষিণ ব্রিক্সটনের মিসেস মেরিলো। আর—ইনি আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ডাক্তার ওয়াটসন। ওয়াটসন, ইনি আমাদের জন্যে একটা দারুণ খবর এনেছেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে নমস্কার আদান-প্রদান করলাম।

—মিসেস মেরিলো, আমি এবং আমার বন্ধু যাবো মিসেস রণারের সঙ্গে দেখা করতে। আমার বন্ধু যাচ্ছে বলে আপনি একটুও কিন্তু করবেন না। কারণ সাক্ষী হিসেবে ওর ওখানে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। আপনি বরং মিসেস রণারকে বুঝিয়ে বলুন।

—হায় ভগবান, মিস্টার হোমস আপনি ভুল বলছেন। ওকে আমার বোঝাতে হবে না। মিসেস মেরিলো অবাক কণ্ঠে বললেন মিসেস রণার আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, বলতে পারেন পাগল হয়ে গেছেন। আর ডাক্তার ওয়াটসনকে আপনি বিনা অনুমতি ছাড়াই নিয়ে যেতে পারেন। এমন কি পাড়ার সকলকে নিয়ে হাজির হলেও উনি বিরক্ত হবেন না।

—উত্তম কথা। দেরী না করে আমরা আজ বিকেলেই যাচ্ছি। মিসেস মেরিলো, আপনি কাহিনীটা আমাকে একবার শুনিয়েছেন। আর একবার যদি বলেন তাহলে ওয়াটসন ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন এবং আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতে পারি। গত সাত বছর ধরে মিসেস রণার আপনার ভাড়াটে ছিলেন, তাই না ?

—হ্যাঁ।

—এই দীর্ঘ সাত বছরের মধ্যে ওঁর মুখ দর্শন করা আপনার ভাগ্যে হয় নি, মাত্র একবার ছাড়া, তাই তো ?

—ঐ একবারই যথেষ্ট। মিসেস মেরিলো আতঙ্কে শিউরে উঠলেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, ঐ মুখ আর আমি দেখতে চাই না, ভগবানের কাছে এই আমার প্রার্থনা।

—খুব ভয়ঙ্কর বিশ্রী মুখ বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। এমন জঘন্য মুখের আকৃতি, ওটা কি মুখ না অন্য কিছু তা বলা দুস্কর। ওর ঐ জঘন্য মুখ দেখে আমাদের গোয়ালা দুধের পাত্র উল্টে একেবারে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলো। তাহলে আপনি ভাবুন, ভদ্রমহিলার মুখটা কত সাজ্যাতিক !

······ওঁর ঐ শ্রীমুখ আমি আচমকা দর্শন করেছিলাম। মনে হয় আমার উপস্থিতি উনি টের পান নি। যখন বুঝতে পারলেন, তখন চটপট মুখটা ওড়নায় ঢেকে ফেললেন। বললেন, মিসেস মেরিলো, এবার বুঝতে পারলেন তো, কেন আমার মুখ সর্বদা ওড়নায় ঢাকা থাকে ?

—ওঁর সম্পর্কে কিছু জানা আছে আপনার ? মানে অতীত জীবন সম্পর্কে ?

—না, ওসব বিন্দু বিসর্গও জানা নেই।

—আপনার বাড়িতে যখন উনি প্রথম এলেন তখন কিছু বলেন নি ?

—উঁহু। ভাড়ার কথা তো নয়ই। এমন কি কোনরকম শর্ত না করে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিলেন। আমার ঐ সময় টাকার ভীষণ দরকার ছিল। তাই বুঝতেই পারছেন, কথা না বাড়িয়ে টাকাগুলো আমি নিয়ে নিয়েছিলাম।

—আচ্ছা, আপনার ঘর সম্পর্কে উনি কি কিছু বলেছিলেন ?

—বলেছিলেন। কথায় কথায় বললেন, রাস্তার থেকে একটু দূরে এমন নিরিবিলি ঘরই ওঁর পছন্দ। মিঃ হোমস, আমার অনুমান, উনি পারিবারিক ব্যাপারে দারুণ অশান্তি ভোগ করছিলেন নিশ্চয়ই। তাই মনের মত ঘর পেয়ে ভাড়া নিয়েও দরাদরি করেননি।

—তাহলে আপনি একবার তাঁর মুখ দেখেছেন, এটাই হলো মোদ্দা কথা। মিসেস মেরিলো, ব্যাপারটা মোটেই সাধারণ নয়, খুবই অদ্ভুত। আপনি নিশ্চয়ই এর আসল রহস্য জানার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন ?

—না, মিস্টার হোমস। আমি চাই না ঝামেলা করতে। কারণ রহস্য জানতে গেলেই হবে নানারকম ঝঞ্ঝাট। তাছাড়া ভদ্রমহিলার ওপর আমি খুশী। ভাড়া নিয়ে কখনও ঝামেলা হয় না। অমন ভাড়াটে আপনি দ্বিতীয়টি পাবেন না।

—তাহলে আপনি কিজন্য এসেছেন ?

—ওঁর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা ভেবে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছি। দিন দিন ওঁর শরীর ভেঙে পড়ছে। একদিন রাত্রে এক ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনে আমি চমকে উঠলাম। কয়েক দিন আগের ঘটনা সারা বাড়ি কাঁপিয়ে মিসেস রণারের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হলো—খুনী ! তুমি খুনী ! তুমি একটা শয়তান ! জঘন্য পশু !

...পরের দিন ভোরবেলায় গেলাম ওঁর কাছে। আমি বিশেষ করে অনুরোধ করলাম, "মিসেস রণার, কোন কারণে যদি আপনি আঘাত পেয়ে থাকেন, পাদরীর সঙ্গে দেখা করুন। নয়তো পুলিশের শরণাপন্ন হন, আপনি সাহায্য পাবেন।"

···না না, পুলিশের কাছে যেতে বলবেন না। ওঁর কণ্ঠে আতঙ্ক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর পাদরী সাহেব কি আমার অতীত পাল্টে দিতে পারবেন? অসম্ভব। মৃত্যুর আগে আসল ঘটনাটা যদি কাউকে বলে যেতে পারতাম তাহলে আমি সবচেয়ে বেশি শান্তি পেতাম।

···ঐ সময় আপনার কথা আমার মনে পড়ে গেল। কাগজে তো প্রায় দিনই আপনার কীর্তিকাহিনীর কথা পাড়ি। তাই বললাম, আপনি বরং কোন সত্যান্বেষীর কাছে যান।

···বিশ্বাস করুন, মিস্টার হোমস, আমার নাম শুনে উনি সোজা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। উনি ফিসফিসিয়ে বললেন, এই কথাটা ভগবান আমাকে আগে কেন মনে করিয়ে দেননি? মিনতি করে বললেন, মিসেস মেরিলো আপনি দেরী না করে তাকেই ডেকে আনুন। যদি উনি আসতে রাজী না হন, তাহলে আমার পরিচয় দেবেন—বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা মিস্টার রণারের বউ। তবুও যদি আপত্তি করেন তাহলে বলবেন—আব্বাস পারভা। তারপর উনি নিজে হাতে 'আব্বাস পারভা' নামটা লিখে দিলেন। আরো বললেন, যাঁর কথা ভেবেছি, তিনি যদি সেই লোক হন তাহলে এই পরিচয়ই যথেষ্ট।

হোমস মুচকি হেসে জবাব দিলেন—ওঁর ধারণা ঠিকই। যাক, মিসেস মেরিলো, আপনি এখন আসুন। ব্যাপারটা নিয়ে ওয়াটসনের সঙ্গে আলোচনা করি। আমরা বিকেল তিনটে নাগাদ আপনার ব্রিকসটনের বাড়িতে যাচ্ছি।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে হোমস তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের কোণে রাখা সারি সারি ফাইলগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ ফাইলগুলোর দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে একটা ফাইল টেনে নিলেন। আবার নিজের আসনে এসে বসলেন। লক্ষ্য করলাম, ওঁর মুখে হাসির

ছোঁয়া, সম্ভবতঃ কোন হদিস পেয়েছেন। নীরবে একমনে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আমার তখন কিছু করার নেই।

একসময় হোমসের কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো।

—সে সময়ে কেসটা আমাকে খুবই বিব্রত করে তুলেছিলো ওয়াটসন। এবং স্বীকার করতে বাধ্য নেই, কেসটার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে পাশের নোটগুলো দেখলে, তোমার বুঝতে দেরী হবে না, মৃত্যু সংক্রান্ত সরকারী তদন্তের রিপোর্টে যে ভুল ছিল সেটা আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। আচ্ছা ওয়াটসন, আব্বাস পারভার ঘটনা কি তোমার একটুও মনে নেই ?

আমি মাথা নাড়লাম—না।

—কিন্তু ঐ সময় তুমি তো আমার সাথেই ছিলে বলে মনে হয়। তবে বলতে পারো, সবচেয়ে কোথায় আমি বেশি অসুবিধা বোধ করি ? ঘটনাটা অনুসন্ধান করার জন্য কোন পক্ষই আমাকে অনুরোধ করেনি। নিজের আগ্রহেই এগিয়ে ছিলাম। কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের অভাবে বেশি এগোতে পারি নি।

—কিছুটা শুনলে আমার হয়তো মনে পড়বে।

—শোন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার মুখ্য চরিত্র মিস্টার এবং মিসেস রণার। ওঁদের নাম সবাই জানতো। বিখ্যাত সার্কাসওয়ালা নামে ওঁদের তখন বিরাট নাম ডাক। ওঁদের সঙ্গে রেশারেশি করে চলতো উম্বওয়েল আর স্যাঙ্গার। অবশ্য এটা যে সময়ের ঘটনা তখন ওঁদের আর্থিক অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছিল। উইম্বেলডনে খেলা দেখাতে যাবার সময় সার্কাসের দলটা বার্কশায়ারের ছোট একটা গ্রাম আব্বাস পারভায় যখন রাত কাটানোর জন্য তাঁবু ফেলে-ছিলো, সেই সময় এই দুঃখজনক ঘটনাটা ঘটে।

…সার্কাসের লোকজন তো কম নয়, আর জীবজন্তুও অনেক ছিল। এই দলে ছিল একটা বিরাট সিংহ। উত্তর আফ্রিকা থেকে আনা।

তার পোষাকী নাম 'সাহারা সম্রাট'। মিস্টার এবং মিসেস রণার খাঁচার মধ্যে ঢুকে খেলা দেখাতেন। এই যে এই ছবিটা দেখো, তাহলেই বুঝবে সিংহটা কি ভয়ঙ্কর ধরনের বিপজ্জনক ছিলো। ওর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ছোটখাটো দৈত্যের চেহারায় মিঃ রণার আর ওঁর পাশে রয়েছেন ওঁর রূপসী স্ত্রী।

…সিংহটাকে রোজ রাত্রে খাওয়াতে যেতেন মিঃ রণার, নতুবা তাঁর স্ত্রী। মাঝে মধ্যে দুজনেই যেতেন। এছাড়া অন্য কাউকে পাঠানো হতো না। কারণ সিংহটা আর কাউকে প্রভু বলে মেনে নিতে রাজী ছিল না। যেহেতু ওঁরা ওকে খেতে দিতেন। তাই ওঁরাই ছিল ওর মনিব।

…যে ঘটনাটি তোমাকে বলছি, তা ঘটে আজ থেকে সাত বছর আগে। সেই রাত্রে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সিংহটাকে খাওয়াতে গিয়েছিলেন। ঐদিন যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে তার সম্পূর্ণ বিবরণ আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।

…মহিলার ভয়ার্ত চিৎকার আর হিংস্র পশুর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জনে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো। সারা তাঁবুর লোক বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠেছিলো। এমন কি খোয়াড়ের জীব-জন্তু পর্যন্ত সচকিত হয়ে উঠলো। কর্মচারীরা আলো নিয়ে ছুটে এলো। সেখানে গিয়ে তারা যে বীভৎস দৃশ্য দেখলো, তা কোনদিন তারা ভুলতে পারেনি। দেখলো, খাঁচার দরজা খোলা। আর ঠিক সামনেই মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন মিসেস রণার। সিংহটা তার ওপর ঝুঁকে পড়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে গজরাচ্ছে।

…সিংহের থাবার নখের আঁচড়ে মিসেস রণারের মুখ একেবারে ফালাফালা হয়ে গেছে। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে কেউ ভাবতে পারেনি, উনি আবার বেঁচে উঠবেন। সার্কাস দলের সবচেয়ে বলশালী লোক লিওনার্দো, ভাঁড় গ্রিগস এবং আরও কয়েকজন মিলে লাঠির সাহায্যে সিংহটাকে খাঁচার মধ্যে ফেরত পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খিল এঁটে দেয়।

কিন্তু সবচেয়ে বড় রহস্যময় প্রশ্ন হলো, সিংহ কিভাবে ছাড়া পেলো ?

…অনেকে বলেন, খাঁচার মধ্যে ঢোকার জন্যে যখন রণার দম্পতি দরজার খুব কাছাকাছি আসেন, তখনই সিংহটা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গভীর প্রলাপের মধ্যে মিসেস রণারে 'ভীরু! ভীরু'! বলে আর্তনাদ করে ওঠা ছাড়া সাক্ষ্যপ্রমাণে উল্লেখযোগ্য আর কোন সূত্রই পাওয়া যায়নি। সার্কাস পার্টির ভ্যানে করেই ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ছ'মাস পরে উনি একটু সুস্থ হয়ে ওঠেন। ফলে সাক্ষী সাবৎ না থাকায় মিঃ রণারের হঠাৎ মৃত্যুর রহস্যটা এখানেই চাপা পড়ে যায়।

—এছাড়া আর কিছু করার তো নেই ? আমি বললাম।

—তা অবশ্য ঠিক। তবু এমন দু একটা সূত্র ছিল যা বার্ক-সায়ার কনস্ট্যাবিউলারির তরুণ এডমাণ্ডকে রীতিমতো বিব্রত করে তুলেছিল। বয়সের তুলনায় ভীষণ চালাক। ওকে পরে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি ব্যাপারটা ওর কাছ থেকেই প্রথমে জানতে পারি।

—এতক্ষণে মনে পড়েছে। তুমি নিশ্চয়ই সেই ছিপছিপে চেহারার কটা চুলের ভদ্রলোকটার কথা বলছো ?

—আগেই, বলেছি, একটু ধরিয়ে দিলেই মনে পড়বে।

—কিন্তু কি ব্যাপারে উনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন।

—ওয়াটসন, ও কি একাই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে আমারও মাথাব্যথা হয়েছিল। আসলে ব্যাপারটা প্রথম থেকেই পাকিয়ে ফেলা হয়েছিল। মনে করো সিংহটার কথা। খাঁচার দরজা খোলা ছিল। বলতে গেলে সিংহটা ছাড়াই ছিলো। এবার ভাবো, রণার দম্পতি আসছে। তখন সিংহটা কি করলো ?

…সাহারা সম্রাট গুটি গুটি এগিয়ে এলো গোটা ছয়েক লাফে। ওর হাবভাব বুঝতে পেরে মিস্টার রণার পালাতে গিয়ে পালাতে পারলেন না। সিংহ তাকে পেছন থেকে আক্রমণ করলো। কেননা মিস্টার

রণারের মাথার পেছন দিকে থাবার চিহ্ন পাওয়া যায়। তারপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মিসেস রণারের ওপর। হিংস্র নখে তাঁর মুখটা ক্ষত-বিক্ষত করে দিলো।

…আবার ভদ্রমহিলার আর্তনাদের কথা ভাবো। ওঁর চীৎকার শুনে মনে হয় ভদ্রলোক স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি। সেই মুহূর্তে স্ত্রীকে বাঁচানো তাঁর পক্ষে কি করে সম্ভব? অতএব গলদটা ঠিক ধরতে পারছো নিশ্চয়ই?

—বুঝলাম।

—এছাড়া আর একটা অসুবিধা আছে। আমার খুব ভালোভাবেই স্মরণে আছে, সাক্ষ্যপ্রমাণে পরিষ্কার বলা হয়েছিল, সিংহটার গর্জন এবং ভদ্রমহিলার ভয়চকিত চীৎকার একই সময়ে শোনা যায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে একটি আতঙ্কগ্রস্ত পুরুষের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল।

—লোকটা রণার ছাড়া কেউ নয়, না?

—কি করে তুমি এই সিদ্ধান্তে এলে? যে লোকটার মাথা একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে, তার কি তখন চীৎকার করার মত ক্ষমতা থাকে? দুজনের সাক্ষী থেকে জানা যায় ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরের পরেই ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়।

—ততক্ষণে তাঁবুতে হুলুস্থুল পড়ে গেছে মনে হয়। আর তুমি বলছো না, পুরুষ কণ্ঠ কার? এ প্রশ্নের জবাবে আমি তোমায় কিছুটা নির্দেশ দিতে পারি।

—বেশ তো বলো না। তাহলে তো সুবিধা হয়।

—মিস্টার এবং মিসেস রণার যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন সিংহটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসে। ভদ্রলোক ভয়ে পিছু হটেন। তখন সিংহ তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ভদ্রমহিলা তখন ভাবলেন, এগিয়ে গিয়ে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে দেবেন। কিন্তু তাঁকেও সিংহ আক্রমণ করলো। মাটিতে ফেলে দিয়ে মুখ ছিঁড়ে চিরে দিলো। ঐ সময় ভদ্রমহিলা 'ভীরু! ভীরু'! বলে চেঁচিয়ে ছিলেন এই কারণে, তাঁর স্বামী

যদি পশুরাজের সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতেন, তাহলে হয়তো হিংস্র পশুটা শান্ত হতো। কিন্তু পালাতে গিয়ে বাঁধালেন গণ্ডগোল।

—ওয়াটসন, তোমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে বাহবা দিই। তবে তোমার চিন্তাধারার মধ্যে একটা খুঁত রয়ে গেছে।

—খুঁত? কি রকম?

—দুজনেই যদি খাঁচা থেকে অন্ততঃ দশ গজ দূরে থাকে তাহলে সিংহটা কি করে বাইরে এলো? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

—যতদূর মনে হয় ওঁদের কোন শত্রুই আগে থেকে সিংহের খাঁচার দরজাটা খুলে রেখেছিল।

কিন্তু যে জন্তুটা ওদের পোষা, ঐ খাঁচার মধ্যে ঢুকে তাঁরা খেলা দেখায়, সেই জন্তুটা হঠাৎ কি কারণে অমন ভয়াবহ কাণ্ড করে বসলো?

—মনে হয় যে শত্রু দরজা খুলে রেখেছিল, সেই এমন কি করেছিল, ফলে সিংহ চাপা আক্রোশে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।

হোমস আর কোন জবাব দিলেন না। চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। একসময়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—হয়তো তোমার অনুমানই ঠিক ওয়াটসন। মিস্টার রণারের মত লোকের শত্রু ছিল অনেক। উনি ছিলেন মদখোর মানুষ। এডমাণ্ডের কাছে শোনা, ওঁর বদমেজাজী স্বভাবের জন্যে দলের সকলে ওঁকে সমঝে চলতো।

...মিসেস রণার যে রাত্রে 'খুনী! শয়তান!' বলে তীব্র চীৎকার করে ওঠেন তা ওঁর স্বামীর কথা স্মরণ করেই বলেন, তা নিঃসন্দেহে। যাই হোক, যতক্ষণ না প্রতিটি ঘটনা জানতে পারছি তার আগে আমাদের কল্পনা করা অর্থহীন।

...খুব খিদে পেয়েছে। ওয়াটসন, কিছু মনে করো না, ঐ আলমারিতে বনতিতিরের মাংস রয়েছে, নিয়ে এসো। আর ঐ মঁস্ত্রাসের বোতলটা আনতে ভুলো না। কাজে নামার আগে উৎসাহটাকে একবার চাঙ্গা করে নিই।

* * *

মিসেস মেরিলোর বাড়ির সামনে এক্কাটা এসে থামলো। দেখি বিশাল বপু নিয়ে ভদ্রমহিলা দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। সম্ভবতঃ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

তিনি মিনতির সুরে বললেন—দেখবেন ঝামেলার ঠেলায় আমায় অমন সুন্দর ভাড়াটিয়াকে যেন হারাতে না হয়।

হোমস তাঁকে আশ্বাস দিলেন। তাঁর চোখেমুখে ফুটে উঠলো কৃতজ্ঞতা মিশ্রিত খুশীর আবেগ। আমাদের নিয়ে এগোলেন তিনি সিঁড়ির দিকে। পুরনো গালচে পাতা। সোজা দোতলায় এসে হাজির হলাম।

খাঁচা মত ঐ ঘরটা ছাড়া দোতলার আর কোন ঘর নেই। আলো বাতাসবিহীন দরজা-জানালা বন্ধ ঘর। চারদিকে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। এই ঘরেই বাস করেন ভাড়াটে মিসেস রণার। যাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে খাঁচার মধ্যে, সিংহের খেলা দেখিয়েছেন তিনি আজ নিজেই সিংহ হয়ে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন অন্ধকার খুপরীতে। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস!

ঘরের এককোণে একটি আরাম কেদারা। নীরবে বসে আছেন মিসেস রণার। একসময়ে উনি যে সত্যিই রূপসী ছিলেন তা ওঁর আশ্চর্য সুন্দর মুখটির দিকে তাকালে আজও ধরা পড়ে। তবে দীর্ঘদিন অলস জীবন কাটানোর ফলে দেহে এসেছে শৈথিল্য। কুচকুচে কালো ওড়নায় মুখ আবৃত, তবু ঠোঁটের নীচের দিক থেকে থুতনির নিটোল রেখাটা স্পষ্ট নজরে পড়লো। আশ্চর্য মসৃণ ঐ অনাবৃত অংশটুকু দেখেই বলে দেওয়া যায় ভদ্রমহিলা নিঃসন্দেহে এক সময়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। রূপ যেমন মিষ্টি, তেমনি তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর এবং নিটোল।

—মিঃ হোমস, মিসেস রণারের মিহি কণ্ঠস্বর শোনা গেল, আপনার নাম আপনি নিশ্চয় শুনেছেন? বোধহয় সেই কারণেই আপনি সহজেই এসেছেন এখানে। কি ঠিক বলেছি?

—হ্যাঁ, আপনার ধারণাই ঠিক। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার

ধাঁধা লাগছে, আপনি কি করে আন্দাজ করলেন, আপনাদের ঐ ঘটনায় আমি বিশেষ করে কৌতূহলী ছিলাম।

—আমি জানতে পারি স্থানীয় গোয়েন্দা মিস্টার এডমাণ্ডের কাছে। তখন আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলাম। ঘটনাটা পুরোপুরি তিনি জানতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে মিথ্যে বলেছিলাম। কিন্তু মিথ্যে বলার জন্যে আমাকে আজও অনুতাপ করতে হচ্ছে। যদি সত্যিটাই বলে দিতাম তাহলে বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ করতাম।

ঠিকই বলেছেন। সত্যি বলাই পাকা বুদ্ধির পরিচায়ক। কিন্তু ম্যাডাম, আপনি কেন মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন?

—তখন তার ওপর একজনের ভাগ্য নির্ভর করছিল। কিন্তু যার জন্যে আমার এত ভাবনা, সে ছিল একটা অমানুষ। ওর কোন ক্ষতি করতে গেলেও আমার বিবেক বাধা দিয়েছে। আমরা ছুজনে খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

—কিন্তু সে প্রতিবন্ধকতা কি এখন শেষ হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, সে আর বেঁচে নেই।

—তাহলে পুলিশকে সব জানাতে ভয় কিসের?

—ভয় আছে মিস্টার হোমস। একজনের জন্যে আমি দিনরাত চিন্তিত, সে হলাম আমি নিজে। পুলিশকে সব জানাতে আমার আপত্তি নেই। জানেন তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। যদি একবার এই নিয়ে ঝামেলা শুরু হয় তাহলে আমাকে কেন্দ্র করে অনেক কুৎসা কলঙ্ক রটবে। আমি বেঁচে ওসব শুনতে রাজী নই মিস্টার হোমস। আমি চাই, জীবনের বাকি দিনগুলি একটু শান্তিতে কাটাতে। জানি আমার পরমায়ু ঘনিয়ে এসেছে। তাই আমার ইচ্ছা, আমার জীবনের ভয়ঙ্কর এই কাহিনী এমন কাউকে জানাতে চাই যে আমার মৃত্যুর পর সাক্ষী দিতে পারবেন।

—ম্যাডাম, আপনি আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন।

আপনার নির্দেশ অনুযায়ী এ ঘটনাটা কেউ জানতে পারবে না, যতদিন আপনি বেঁচে আছেন।

—মিস্টার হোমস, আপনার চরিত্র এবং কার্যবিধি সম্পর্কে আমার কিছুই অজানা নেই। দীর্ঘ সাত বছর অলস জীবনের মধ্যে কেবল আপনার লেখা বই পড়ে কাটিয়েছি। এই টুকুই তো আমার আনন্দ। আমার জীবনের মর্মান্তিক কাহিনী শুনে আপনার যা-ই মনে হোক না কেন, তবু আপনাকে বলে নিজেকে হালকা করতে চাই। এ সুযোগ আমি নষ্ট করতে চাই না।

—আপনি কোন রকম দ্বিধা না করে বলুন ম্যাডাম। আপনার এই ঘটনা শোনার জন্যে আমি এবং আমার বন্ধু আগ্রহী। খুব খুশীও হবো।

মিসেস রণার ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলের ড্রয়ার খুলে বের করলেন কয়েকটা ফটো। প্রথম ছবিটা এগিয়ে দিলেন আমাদের দিকে। বললেন—এ-ই লিওনার্দো।

মহিলার কণ্ঠস্বরে চাপা মলিনতা।

সুন্দর বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারার এক ভদ্রলোক। পরণে সার্কাসে দড়ির খেলা দেখানোর মত পোশাক। তার শক্ত সমর্থ পেশীবহুল হাতদুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি করে ভাঁজ করা। কুচকুচে কালো গোঁফের আড়ালে উঁকি দিচ্ছে এক টুকরো মিষ্টি হাসি।

—লিওনার্দো মানে, সেই ভদ্রলোক যিনি লাঠির সাহায্যে—

—হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। আর এই আমার স্বামী।

ভদ্রলোকের ক্রুদ্ধ মুখ ও গোলগাল চেহারা মিলিয়ে বলা যায় একটা ছোটখাটো দৈত্য। এর থেকে বুনো শূয়োর বললে আরো ভালো মানাতো। মানুষের থেকে পশুর সঙ্গে ওঁর আকৃতির বেশি মিল রয়েছে। হাতির মত ছোট ছোট চোখে বিদ্বেষ উপচে উঠছে।

—মিস্টার হোমস, ছবিদুটো দেখালাম এই কারণে যে কাহিনীটা আপনারা তাহলে সহজে বুঝতে পারবেন। খুব ছোটবেলা থেকেই

আমি সার্কাসে নাম দিই। বলা যায় আমি ছিলাম মায়ে তাড়ানো, বাপে খ্যাদানো মেয়ে। তাই সেই ভাবেই বড় হয়েছি।

ধীরে ধীরে বড় হলাম। আমার উদ্ধত যৌবন এই ভদ্রলোককে আকর্ষণ করলো এবং হঠাৎই আমাদের বিয়ে হলো। সেইদিন থেকে শুরু হলো আমার জীবনে নতুন অধ্যায়। আমি যেন একটা শয়তানের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলাম। আমার ওপর শুরু হলো তাঁর অকথ্য অত্যাচার। ওর বজ্জাতির কথা সবাই জানতো। দলের অন্যান্য লোকদের সঙ্গে একটু বেশি মেলামেশা করলেই ওঁর যেন গা জ্বালা করতো। যদি প্রতিবাদ করতাম তাহলে চাবুক পড়তো পিঠে। বাধা দেওয়ার উপায় থাকতো না, কেননা হাত পা বেঁধে দিতো।

...ওকে যেমন সবাই যমের মত ভয় করতো তেমনি আমাকে লোকে ভালোবাসতো। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল আমার স্বামী। সর্বদা মদপান করে নেশায় গুম হয়ে থাকতো। ঐ সময় কাউকে খুন করতেও ওর অসুবিধে হতোনা। পশুদের ওপর চালাতো নির্যাতন। ফলে অনেকবার বহু টাকা দণ্ড দিতে হয়েছে। তবু ওর স্বভাব এতটুকু পাল্টায়নি। ওর উৎপীড়নের ঠেলায় ভাল ভাল লোকেরা দল ছেড়ে পালালো। ফলে দলের অবস্থা শোচনীয় হলো। তখন সার্কাস সামলাবার জন্যে ছিলাম আমি, লিওনার্দো আর ভাঁড় জিমি গ্রিগস।

...লিওনার্দো যে কখন আমার মনের গহনে প্রবেশ করেছিল জানি না। যখন টের পেলাম, তখন ও আমার অনেক কাছে এসে পড়েছে। মিস্টার হোমস, আপনি ছবিটা ভালো করে দেখুন, নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন সেটা আদৌ কিছু বিচিত্র নয়। আমার কাছে ও ছিল দেবতুল্য। আমাকে ও সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করতো সাহায্য করার।

...আমি ওকে কেন্দ্র করে রঙিন স্বপ্ন দেখলাম। আমাদের গভীর ভালোবাসা কোনদিন যে বাস্তবে উপলব্ধি করতে পারবো তা কখনও ভাবিনি। আমার সন্দেহপ্রবণ স্বামী সব বুঝতে পারলো।

কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম, আগুনে ও হাত দেবেনা। ও ছিল ভীরু, কাপুরুষ। ও একমাত্র যাকে ভয় পেতো সে হলো লিওনার্দো। তাই আমার ওপর ওর রাগ এসে পড়লো। নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে গেল।

…ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার কয়েকদিন আগের কথা বলছি। রাত্রে আমার কান্না শুনে লিওনার্দো ছুটে এলো। আমাদের তাঁবুর বাইরে রইলো। সেই রাত্রেই আমরা দুজনে স্থির করলাম, এভাবে আর চলা যায় না। অতএব আমাদের দুজনের মধ্যে বাধা যে লোকটি তাকে সরিয়ে দেওয়া উচিত। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মত যোগ্যতা ওর নেই।

…লিওনার্দো খুব বুদ্ধিমান। সমস্ত পরিকল্পনা তৈরী করলো। অবশ্য আমিও এ ব্যাপারে সায় দিয়েছিলাম বলে অতটা এগোবার সাহস পেয়েছিল। সেইসময় আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম। ওর জন্যে প্রাণ দিতেও আপত্তি ছিলনা। ওর অদ্ভুত ধরনের পরিকল্পনা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল রীতিমত। একটা লম্বা লাঠির মাথায় লাগানো ছিল সীসের ভারি একটা চাকতি। ঐ চাকতির সঙ্গে আটকে দিয়েছিল ইস্পাতের ধারালো পাঁচটা পেরেক। ঠিক যেন সিংহের উদ্ধত একটা থাবা। ঐ অস্ত্রের আঘাতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। সবাই অনুমান করে, সিংহের থাবাই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

…সেদিন ছিল অন্ধকার ঘুটঘুটে রাত। নিয়মমাফিক আমি আর আমার স্বামী বালতি ভর্তি করে কাঁচা মাংস নিয়ে হাজির হলাম। পরিকল্পনা মত লিওনার্দো একটা বড় তাঁবুর আড়ালে লুকিয়ে রইলো যার পাশ দিয়েই আমাদের সিংহের খাঁচার দিকে আসতে হবে।

…আমার স্বামী একটু আস্তে হাঁটতো। তাই তাঁবুর কাছাকাছি এসে আমি জোরে জোরে পা চালালাম। ও পড়ে রইলো পেছনে। ওর মৃত্যু নিজের চোখে যাতে দেখতে না হয় তাই এগিয়ে এসেছিলাম। পরক্ষণেই শুনলাম থাবাওয়ালা লাঠির আঘাতের সঙ্গে ওর মাথাটা

ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়ার শব্দ। বিশ্বাস করুন মিস্টার হোমস, আনন্দে আমি লাফিয়ে উঠলাম। অতিরিক্ত উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে খাঁচার খিল খুলে দিলাম।

…সেই সময়ে ঘটলো আমার জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। সিংহটা লাফিয়ে বাইরে এলো। বুঝলাম, রক্তের গন্ধ ওকে উন্মাদ করে তুলেছে। ঐ সময়ের কথা ভাবলে আজও আমার দেহের লোম খাঁড়া হয়ে ওঠে।

…বিকট গর্জন করে দেহ ফুলিয়ে প্রবল আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার ওপর। ঐ সময় আমাকে কিন্তু লিওনার্দো বাঁচাতে পারতো। ও যদি সাহস করে লাঠিটা নিয়ে এসে সিংহটাকে তাড়া করতো তাহলেই আমি ছাড়া পেতাম। কিন্তু ও ভয়ার্ত এক চিৎকার করে আমাকে সিংহের মুখে রেখে পালালো। জন্তুটা আমার মুখটা আচড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিলো। আমি কিন্তু একটুও যন্ত্রণা অনুভব করলাম না। কারণ ওর উত্তপ্ত বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমার সারা মুখ তখন পুড়ে যাচ্ছিল। আমি ওর রক্তমাখা চোয়াল সরানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মুক্তির তাগাদায় যত জোরে পারলাম চেঁচালাম। ধীরে ধীরে আমি নিস্তেজ হয়ে পড়ি। আলো নিয়ে ছুটে এসেছিল দলের লোকেরা। তারপরে আমার কি হলো জানি না।

…তারপর একটানা ছমাস বিছানায় পড়ে রইলাম। ধীরে ধীরে উঠলাম। বলতে পারেন মরণের পার থেকে ফিরে এসেছি। আয়নায় নিজের মুখ দেখে নিজেই আৎকে উঠলাম। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালাম। সিংহটাকে এই বলে অভিশাপ দিলাম—কেন ও আমাকে চিরদিনের মত শেষ করে দিলো না। আমার সুন্দর রূপের জন্য কিন্তু একটুও আপসোস হয় না মিস্টার হোমস।

…আমার প্রচুর টাকা আছে। তাই ঠিক করলাম বেঁচে থাকার জন্য এমন এক নির্জন জায়গা যেখানে কেউ আমায় বিরক্ত করবে না।

জানবে না আমার পরিচয়, পাবেনা আমার খোঁজ। এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। সেই থেকে এক অন্ধকার ঘরে আশ্রয় নিয়েছি মুক্তির আশায়। আহত পশুর মত ধুঁকছি আর মৃত্যুর জন্য দিন গোনছি। ইউজেনিয়া রণারের জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় সুখ মিস্টার হোমস।

মিসেস রণার তাঁর বিবৃতি শেষ করে ম্লান মুখে বসে রইলেন। আমরাও পাথরের মত কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। একসময়ে আমরা সম্বিত ফিরে পেলাম।

হোমস চেয়ার ছেড়ে ধীর গতিতে এগিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলার দিকে। তাঁর কাঁধের ওপর রাখলেন গভীর মমতায় ভরা হাতের স্পর্শ। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ম্যাডাম, এ সবই নিয়তির ফল। ঘটনাটা সত্যিই খুব দুর্ভাগ্যজনক। জীবনে সত্যিকারের অবলম্বন না থাকলে এই পৃথিবীটাকে নিষ্ঠুর ভাবাই স্বাভাবিক। এবার বলুন, শেষ পর্যন্ত লিওনার্দোর কি হলো ?

—সেই রাত থেকেই ও আমার কাছ থেকে বেপাত্তা। ওর কোন খবর পাইনি বা রাখার চেষ্টাও করিনি। যদিও সিংহের হিংস্র থাবার নীচে আমাকে ঐভাবে ফেলে রেখে ও কাপুরুষের মত পালিয়েছিল, আমার সবচেয়ে প্রয়োজনের দিনে ও আমাকে একেবারে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে, তবু ওকে আমি ফাঁসি কাঠে ঝোলাতে চাইনি।

···জানবেন মেয়েরা যাকে একবার ভালোবাসে, যাকে মন দেয় তার সঙ্গে কখনো বেইমানি করে না। কিন্তু সেই তুলনায় লিওনার্দোর ভালোবাসা ছিল কাচের বাসনের মত। আমার কি হবে না হবে তা নিয়ে কখনও ভাবিনি। আমার এই জঘন্য জীবনের চাইতে ভয়ঙ্কর আর কি হতে পারে আপনি নিজেই বলুন। তাই লিওনার্দো আর তার ভাগ্যের মাঝে আমাকে নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে।

—উনি কি বেঁচে আছেন ?

—না, গত্ত মাসে একটা কাগজ পড়ে জানতে পারলাম মার্গেটের কাছে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মারা যায়।

—যে অস্ত্রটা দিয়ে উনি মানুষ মেরেছিলেন, যেটা আপনার কাহিনীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেটার কি হলো ?

—মিস্টার হোমস, এ প্রশ্নের উত্তর আমার অজানা। তবে সম্ভবতঃ তাঁবুর পাশেই যে গভীর খাদ ছিলো সেইখানেই ওটা…

—বুঝেছি। এখানেই ব্যাপারটার সমাপ্তি টানা হয়েছে।

একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে মিসেস রণার বললেন—হ্যাঁ, এখানেই সমাপ্ত।

এবার আমাদের বিদায় নেওয়ার পালা। কিন্তু ভদ্রমহিলার করুণ কণ্ঠস্বর আমাদের কিছুতেই ফিরে যেতে দিচ্ছিল না।

হোম্‌স মৃদু কণ্ঠে বললেন—মিসেস রণার, আপনি এত দুর্বল হয়ে পড়বেন না। জীবন কারো হাতের পুতুল নয়। আপনি কি পারেন না আপনার জীবনকে পাল্টে দিতে।

—কিন্তু তাতে কার লাভ বলুন ?

—সে কথা কেউ হলফ করে বলতে পারে না।

—আমি পারি। মিসেস রণারের গলার স্বর কঠিন হয়ে উঠলো। দৃপ্ত পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে এলেন উজ্জ্বল আলোর সামনে। এক ঝটকায় সরিয়ে নিলেন মুখের কালো ওড়না। এবার তাকান তো আমার মুখের দিকে। পারেন কিনা সহ্য করতে ?

সত্যি, ঐ বীভৎস মুখ দেখলে যে কোন লোকের ভয়ে আৎকে ওঠার কথা ; সেই বীভৎস মুখের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মুখের ওপর নাক, মুখ বলে কিছুই আলাদা নেই। সাহারা সম্রাট তার মুখের কাঠামোটা কেড়ে নিয়েছে। একজোড়া চোখের অলৌকিক দৃষ্টি যেন দূর গহ্বর থেকে ছুটে আসছে। আমরা সে দৃশ্য

আর দেখতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম।

* * *

উপরোক্ত রহস্য সমাধানের দুদিন পর শার্লক হোমসের বাড়িতে গেলাম গল্প গুজব করে সময় কাটানোর জন্য।

আমাকে দেখে হোমস তাঁর স্বভাব অনুযায়ী উল্লসিত হয়ে উঠলেন। আমাকে তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন।

একটা নীল রঙের শিশির দিকে হোমস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শেলফের ওপর ওটা রাখা ছিল। নামিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম ভালো করে। গায়ে বিষের লাল লেবেল আঁটা। ছিপিটা টান মেরে খুলে ফেললাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা হালকা মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেলো।

—মনে হচ্ছে প্রুসিক অ্যাসিড ?

ভুরু কুঁচকে বিস্ময় ভরা কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করলাম।

—তোমার অনুমান ঠিক। আজকের ডাকে ওটা পেলাম। সেই সঙ্গে একটা চিঠি—

মিস্টার হোমস, বহুদিন ধরে যে সম্পদ আমি সযত্নে আগলে রেখেছিলাম, তা আপনাকে উপহার দিলাম। আর আপনার উপদেশ সম্পূর্ণভাবে পালন করবো।"

...ওয়াটসন, যিনি এটা পাঠিয়েছেন সেই অসাধারণ সাহসী মহিলার নাম তোমাকে না বললেও আশা করি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

[তিন]

আচমকা ঘুমটা ভেঙে যেতেই কানে এলো লাইকার উদ্ধত কর্কশ কণ্ঠস্বর। তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে এপাশ ফিরতে ফিরতে ওকে মসৃণ তিরস্কার করে উঠলাম, চুপ কর লাইকা, তুই ভারী অসভ্য হয়ে গেছিস দেখছি। অমন অসভ্যের মত চীৎকার করছিস কেন?

কিন্তু সেই যে ঘুমটা একবার ভেঙে গেল, তারপর শত চেষ্টা করেও আর দুচোখ এক করতে পারলাম না। এই সময় কিসের যেন একটা ভয় আমাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগলো। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছিল না, কেননা সর্বদা মনে হচ্ছিল কি জানি, চোখ খুললেই হয়তো কি একটা অনর্থক কাণ্ড বাঁধবে।

আমি কি ভুলে গেছি যে, লাইকা আর তার সঙ্গে আমার ব্যবধানের দূরত্বটুকু? আমি জানি, পাঁচ বছর আগেকার আমাদের সেই পরিচিতিটা, দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইলের ব্যবধানের রেখার স্মৃতিমাত্র।

নিজে নিজের এই বোকামো দেখে ক্রুদ্ধ হলাম। মনটাকে ধিক্কার দিলাম, অতীতের কল্পনা থেকে বাস্তবের পথে ফিরে আসতে অনুরোধ জানালাম।

একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি এতক্ষণ স্মৃতিচারণ করছিলাম। আমার কল্পনায় সুন্দর রঙিন জগৎ রঞ্জন করে বাস্তবের যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি থেকে প্রাণপণে বাঁচতে চাইছিলাম।

আমি যে আবার ঘুমোইনি এটা আমার পক্ষে একপ্রকারের পরম সৌভাগ্য বলা যেতে পারে, যদিও তা আমি তখনকার মতো বুঝতে

পারি নি। পরবর্তী পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে তাই আমি কিছুক্ষণের জন্য আবার অতীতের পথে যাত্রা শুরু করেছিলাম। বাস্তবের হাত থেকে এড়াতে রঙিন কল্পনার ভেলায় সুদূরের বুকে পাড়ি দিয়েছিলাম।

*　　*　　*

আমার সঙ্গে লাইকার পরিচয় বড়ো আকস্মিকভাবে হয়েছিল। ওর খোঁজ .করে করেও আমি কিংবা মানমন্দিরের সহকর্মীদের হতাশ হতে হয়েছিল।

গ্রীষ্মকালের মন্দ্যাবেশীয় গাড়ি করে পালামৌর দিকে যেতে যেতে রাস্তার ওপর লাইকাকে পড়ে থাকতে দেখি। তখন ও ছিল নিতান্তই বাচ্চা, নিজের ওপর নির্ভর করারও ক্ষমতা ছিল না? ওর দিকে তাকাতে একটা দুঃসহ ঘৃণার বশবর্তী হয়েও কি এক অদৃশ্য আকর্ষণে দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিতে পারলাম না। কোন মোটর গাড়ির চাকার তলায় পিষ্ট হবার আগেই আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নামলাম। তারপর দুহাতে কুকুরটাকে তুলে নিয়ে ক্ষিপ্রহাতে গাড়ির পেছনদিকের ক্যারিয়ারে রাখলাম, পাছে নতুন গাড়িটা নষ্ট হয়ে না যায় এই ভেবে। ওর গায়ে হাত দেবার আগেই আমি হাতে গ্লাভস পরে নিয়েছিলাম। ঠিক করে নিলাম যে ওটাকে রাস্তায় কারোর হাতে দিয়ে দেবো।

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আবাসস্থল, মনাণ্টারীর সামনে এসে উপস্থিত হলাম। যেই না গাড়ির পেছনে হাত বাড়িয়েছি অমনি ছানাটা কুঁই কুঁই করে উঠলো। ওর মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ওর দিকে বিরক্তিকর দৃষ্টিতে তাকালাম, লক্ষ্য করলাম ছানাটা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ওর চোখের দৃষ্টিটা এত করুণ আর অসহায় ছিল যে আমার হাতটা থমকে দাঁড়িয়ে গেল, চেষ্টা করেও ছানাটাকে দারোয়ানের হাতে তুলে দিতে পারলাম না, বিবেকের আঘাতটা বড় প্রবল হয়ে উঠলো।

তারপর থেকে ছানাটা যতোই বড় হতে লাগলো আমার খরচের মাত্রাও অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে চললো। কুকুরটা আমার মোজা আর জ্যোতির্বিজ্ঞান পত্রিকাগুলোর ওপর তার দাঁতের ধার পরীক্ষা করে আমায় রীতিমত অস্বস্তির মধ্যে ফেলতে লাগলো।

মাঝে মাঝে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ওর দিকে রাগত চোখে তাকিয়ে ওকে চড় দেখাতাম। কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করেই ওর শান্ত নির্বিকার চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। এতো দুরন্ত আর চঞ্চল কুকুরটা মানমন্দিরে গেলে কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন মাঠের ওপর শান্ত হয়ে শুয়ে থাকতো। লাইকাই বোধহয় একমাত্র কুকুর যে দুশো ইঞ্চি ডোমের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে। মাঝে মধ্যে ওপর থেকে আমার গলার আওয়াজ পেলে ও কোন রকম অস্থিরতা প্রকাশ করতো না।

আমাদের মধ্যে সব থেকে প্রধান ডাঃ এণ্ডারসন ওকে খুব ভালো-বাসতেন। তিনি আদর করে নাম রেখেছিলেন 'লাইকা'। লক্ষ্য করছিলাম, ওঁর দেখাদেখি অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও লাইকাকে স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু লাইকা তাঁর প্রভুকেই সব থেকে বেশি মান্য করে চলতো এবং ভালোবাসতো। সবসময় বাধ্য না থাকলেও আমার কথা শুনতো।

লাইকার দেহে প্রায় ৯৫ ভাগ অ্যালসেসিয়ান রক্ত ছিল। দেখতেও ছিল খুব সুন্দর। যতো বড়ো হতে লাগলো ততোই ও আরও সুন্দর হয়ে উঠতে লাগলো। ঘন নরম ছাই রঙের লোমে ঢাকা ছিল ওর গোটা শরীরটা, চোখের ওপর কালো দুটো সুন্দর ছোপ ছিল। ও যখন কান খাড়া করে দাঁড়াতো তখন ওকে ভীষণ বুদ্ধিমান বলে মনে হতো। যখন আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় মত্ত থাকতাম, তখন দেখতাম ও কানখাড়া করে নিবিষ্টচিত্তে আমাদের আলোচনার যৌক্তিকতা বিচার করতো।

অতি অল্পদিনেই কেন জানি না, ও আমার কাছে খুব প্রিয় পাত্র

হয়ে উঠলো, ও আমার নির্জন একাকীত্বে আমাকে সঙ্গ দিতো। মানমন্দির থেকে ফেরার সময় ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তো, প্রবল উত্তেজনায় ওর দুপা অনায়াসে আমার কাধের ওপর তুলে দিতো। অব্যক্ত ভাষায় বিচিত্র কলোরব করে আত্মপ্রকাশ করার প্রাণপণ চেষ্টা করতো। ওর এই ভালোবাসার ধরণটা কেমন যেন আলাদা রকমের ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল ও আমার অল্প দূরের যাত্রায় নিয়ত আমার সঙ্গী হয়ে দাড়িয়েছে—দীর্ঘদিনের জন্য দূরে কোথাও যেতে হলে ওর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও যেন ব্যাকুল হয়ে পড়তো। বারকেলির সেই ভয়ঙ্কর রকমের মারাত্মক সভায় আমি আর লাইকা উভয়েই উপস্থিত ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিত বন্ধুরা আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালো। তাদের গৃহে অতিথি হবার জন্য আমাকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলো। লক্ষ্য করলাম, ওরা যেন লাইকাকে ঠিকমত পছন্দ করছে না। লাইকাও আমার সঙ্গে ওদের ঘরে থাকুক এটা যেন ওদের পছন্দ নয়। ওদের মনোভাব বুঝতে পেরে আমি তাদের ভরসা দিয়ে বললাম, লাইকা মোটেই গোলমাল করার মতো অসভ্য ধরনের কুকুর নয়। ও খুব ভালো, রাতে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে বাড়ির লোকদের নিরাপত্তাদানে ওর জুড়ি নেই।

অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ওরা আমার কথা অমান্য করতে পারলো না। তবে আমার শেষ কথাটার জবাব দিতে খুব নিচু স্বরে বললো, বারকেলিতে চোর ডাকাত নেই।

* * *

মাঝরাতে একটা বিকট চীৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল আমার। শব্দটা শুনেই বুঝতে পারলাম যে নিশ্চয়ই বাড়িতে চোর ঢুকেছে বলে লাইকা সকলকে সাবধান করার জন্য বিকট চীৎকার করছে। মনে পড়ে গেল, ও একবার গরু দেখেও ওইরকম প্রচণ্ড চীৎকার করে উঠেছিল।

ব্যাপারটা কি তা সঠিকভাবে জানার জন্য আমি গায়ের আচ্ছাদনটা সরিয়ে বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। তারপর সেই অন্ধকারে অপরিচিত বাড়ির স্যুইচবোর্ডের খোঁজে হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে এলাম। আমি মনে মনে নিশ্চিন্ত ছিলাম এই ভেবে যে এতক্ষণে নিশ্চয়ই লাইকার চীৎকারে ভীত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় আগন্তুককে বাড়ির মালিক একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে। কিন্তু লাইকার চীৎকার একটানা বেজেই চলেছে। বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'লাইকা চুপ কর বলছি।"

ইতিমধ্যে আমি অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছিলাম। স্যুইচবোর্ডের ওপর হাত দিয়ে ভাবছিলাম, আলো জ্বালবো কি না। কিছুক্ষণ এরকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগে আমি স্যুইচটা টিপে দিতেই বৈদ্যুতিক আলোয় সিঁড়ির নীচটা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠলো। সেই আলোয় দেখলাম, লাইকা সিঁড়ির নীচের সদর দরজাটা প্রচণ্ড আক্রোশে আঁচড়াচ্ছে আর ব্যর্থতাজনিত ক্রোধে মাঝে মাঝে বিকট গর্জন করে উঠছে। কোথাও কেউ নেই।

ওকে ঐরকম অবস্থায় দেখে আমার গা জ্বলে গেল। তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার করে উঠলাম, এতই যদি বাইরে থাকার সাধ, তাহলে আগে বললে না কেন, তোকে বাইরেই রেখে আসতাম।

অসহ্য রাগে আমি দ্রুতপায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। আমার কিছু বোঝার আগেই লাইকা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। সেই নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে দরজা খুলে আমি লাইকার প্রতীক্ষায় চেয়ে রইলাম। আকাশে ঘন কুয়াশার আচ্ছাদন পড়ে গেছে। চাঁদের আলোয় সমস্ত সানফ্রান্সিসকোকে নববধূর মতো বড় মনোরম লাগছে। জলের ওপর ভেসে ওঠা সেই মধুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। রাস্তার বাতির আলোগুলোর মতোই আমি উদাস হয়ে প্রিয় সাথী লাইকার গমন পথের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

প্রচণ্ড ভূমিকম্পের আওয়াজে আমার চেতনা বিপর্যস্ত হলেও আমি কিন্তু নিপুণভাবে জ্ঞান হারাই নি। আশ্চর্যরকমভাবে আমি তখনও ভয়ের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলেছি। একবার মনে হলো ভূতাত্ত্বিকেরা তো আগে থাকতেই আমাদের এ ব্যাপারে সাবধান করে দিতে পারতেন, তাঁরা কেন পূর্বাভাস দেন নি? তারপরেই মনে পড়লো, ভূমিকম্পের মত এমন প্রচণ্ড আওয়াজ আগে কখনও শুনি নি।

পরে বুঝতে পারলাম, এই ভূমিকম্প সাধারণ নিয়মে ঘটেনি। পরদিন সকালে রেডক্রশের লোকেরা আমায় দেখতে পেয়ে সাহায্য করতে চাইলো, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে যেতে চাইলাম না। কেননা, আমার প্রিয়সাথী লাইকাকে এমন অবস্থায় ফেলে রেখে আমার পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

চারদিকের এই বিধ্বস্ত বাড়িগুলোর পাশে ছড়িয়ে পড়া বীভৎস মানুষগুলোর মধ্যে আমি একা জীবিত ছিলাম। মনে হলো বুঝি ভগবান আমাকে লাইকার জন্যই প্রাণদান করেছেন। কিন্তু আমার সাহায্য-কারীরা আমাকে উন্মাদ বলে মনে করলো। অবশ্য ওদের এইরকম ধারণা করা নিতান্তই অস্বাভাবিক নয়। কেননা, এই ভয়ঙ্কর ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো প্রায় সকলেই চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল, পাগলের মতো তাদের প্রিয়জনকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

অল্প সময় পরেই লাইকাকে ফিরে আসতে দেখা গেল। তারপর থেকে আমি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ সযত্নে এড়িয়ে চলতাম, আমি আর লাইকা দুজনে সেই তারাভরা আকাশের নীচে অনেকক্ষণ ধরে মধুর মুহূর্ত যাপন করলাম। সেই কল্পনাময় জগতে আমি আর লাইকা পরম নিশ্চিন্তে বাস করতাম। কিন্তু সুখের দিন চিরস্থায়ী হয় না, তা শীঘ্রই বুঝতে পারলাম।

১৯৬০ সাল থেকেই অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতোই আমি মনে করছিলাম যে মহাকাশ গবেষণা কাজে মানমন্দির বসবাসের ঠিক উপযুক্ত জায়গা নয়। কারণ চাঁদের বুকে ছোট্ট একটা যন্ত্রের কার্যাবলীর

পরিমাণ ও গুরুত্ব এর থেকে অনেক বেশি। আমি বুঝতে পারছিলাম, এবার আমাদের মাউন্ট উইলসন, প্যালেসার, গ্রীনউইচ ও অন্যান্য বিখ্যাত মানমন্দিরগুলো ছেড়ে সুদূর মহাকাশে পাড়ি দিতে হবে।

এইসময় আমি কারসাইড মানমন্দিরের ডেপুটি ডাইরেকটারের পদে উন্নীত হলাম। আমার এই সুদীর্ঘ গবেষণার সাফল্য আনতে হলে চাঁদের বুকে বসে আমাকে গবেষণা চালাতে হবে। তাহলে আমি শীঘ্রই সাফল্য লাভ করতে পারবো বলে একটা ধারণা পোষণ করছিলাম মনে মনে। আমি জানতাম যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বাইরে বেরিয়ে এসে একজন মানুষকে অলৌকিক দৃষ্টি শক্তির অধিকারী হতে হবে।

এই প্রয়োজনীয় কাজের জন্য আমাকে একাই চাঁদের বুকে পাড়ি জমাতে হবে, সঙ্গে লাইকাকে নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, গবেষণার প্রয়োজনীর কাজের জন্যই মহাকাশে জীবজন্তুকে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। হয়তো, আজ থেকে আরো একযুগ পরে সেই অনুমতি দেবেন কর্তৃপক্ষরা। অবশ্য তখনো ওদের পালনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় হয়ে যাবে।

একটা মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে পড়লাম, একদিকে লাইকাকে মহাকাশে আমার সঙ্গী করে নিয়ে যাওয়া, অন্য দিকে পৃথিবীতে থেকে আমার সুদীর্ঘ গবেষণাকে এমনভাবে ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করা —যে কোন একটাকে বেছে নিতে হবে। এ দুইয়ের দ্বিধাদ্বন্দ্বে দুলতে লাগলাম আমি। একবার মনে হলো, লাইকা একটা ক্ষুদ্র প্রাণী মাত্র যার আয়ু একযুগও নয়, অথচ ওর জন্য আমার এতো বছরের গবেষণা নষ্ট হয়ে গেলে আমার সমস্ত জীবনটাই তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আমার মনে হয়, যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই শেষের যুক্তিটাকেই গ্রহণ করবেন। কিন্তু তবুও লাইকার অদৃশ্য আকর্ষণকে উপেক্ষা করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না।

* * *

সমস্ত কিছুই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিলাম শেষপর্যন্ত, ডাঃ এণ্ডারসন

ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই লাইকাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আমিও কি জানি কেন, ওঁদের কথায় সানন্দে সম্মতি জানালাম। ওঁদের কাছে নিজেকে কেমন যেন অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো। লাইকার দিকেও আমি আর আগের মতো তাকাতে পারছিলাম না।

শেষবারের মতো পাহাড়ের ওপর বেড়াতে গেলাম আমরা, সেখানেই আমি নীরবে লাইকাকে বিদায় জানালাম। সেই আমাদের শেষ দেখা, তারপর আর আমার সঙ্গে লাইকার দেখা হয়নি। পৃথিবীর কক্ষপথে একটা বৈদ্যুতিক ঝড়ের জন্য আমাদের যাত্রাকে চব্বিশ ঘণ্টার মতো পেছোতে বাধ্য হলাম। এই সময় উত্তরমেরুর উপরকার কক্ষপথ দিয়ে যাত্রা করাটা উচিত নয় জেনে ড্যাম এলেন কেস্টা আগে থাকতেই কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। একেই আমরা তেজস্ক্রীয় বিরোধী ওষুধ খেয়েছিলাম, তার ওপর আমাদের শরীরের ওজন অসম্ভব রকমে কমে যাওয়াতে একটা বাধার সৃষ্টি হলো।

আমরা যখন সাইড কার-এ এসে পৌঁছলাম তখন আমি সজাগ হলাম। কিন্তু তার আগেই আমরা পৃথিবীর মাধ্যমিক আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছি—সেই দিগন্তে বিলীন হয়ে যাওয়ার সুন্দর দৃশ্যটা অবশ্য আমার চোখে পড়ে নি। কেননা, তখন একটা অপরাধ বোধ আমার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এছাড়াও আমার আগামী কার্যাবলী সম্পর্কে মনে মনে একটা ধারণা করে নিচ্ছিলাম।

একটা অব্যক্ত বেদনা আমার কণ্ঠরোধ করে ফেলেছিল। আমার সাথী লাইকা আমাকে আজ আর বিশ্বাস করে না, আমাকে আর ভালবাসে না—এচিন্তা মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলাম না। ওর চোখে আজ আমি বিশ্বাসঘাতক, নির্দয় এবং ওর পরিত্যক্ত অতীতের সেই মানুষগুলোর মতোই আমিও আজ অমানুষ হয়ে গেছি।

যে আশঙ্কা আমার মনে ঘুরপাক খাচ্ছিল, তাই সত্যি হলো। একমাস পরে মিঃ এণ্ডারসনের পাঠানো চিঠিতে জানা গেল, ওঁদের যথাসাধ্য সেবাকে অবজ্ঞা করেই প্রচণ্ড অভিমানে, ঘৃণিত বেদনায়

লাইকা মারা গেছে। মরে গেলেও আমার সমস্ত কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই লাইকা আমার কাছে বরাবর এসেছে। ওকে ভোলা যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল। তা না হলে সুদীর্ঘ এতো বছরের ব্যবধানেও এই চাঁদের দেশে এসেও লাইকাকে আমি এক-মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারি নি।

যখন আমি মনে মনে ওর বিরুদ্ধে, আমার সপক্ষে একটা কারণ খাড়া করছিলাম তখন একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় সমস্ত বাড়িটার ভিতরটা কেঁপে উঠলো। তাড়তাড়ি আমি আমার পোষাকের ওপর পড়ে থাকা বর্মটা এঁটে নিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই বাড়ির দেওয়ালগুলো প্রচণ্ড ভূমিকম্পে বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের বাতাস ভেতরের ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সম্মোহিত অবস্থায় আমার হাতটা বিপদজ্ঞাপক সুইচের ওপর উঠে এলো—আমাদের দলের দুজন বাদে আর সকলেই সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের মানমন্দিরের তিনটে প্রেসার ডোম কিন্তু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

এর একটা যে কোন বাস্তবসম্মত কারণ থাকতে পারে তা আমি মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলাম। এই আকস্মিক ভূমিকম্পে আমি যেন কেমন হতভম্ব হয়ে পড়লাম।

লাইকাই একমাত্র কুকুর নয় যে সানফ্রান্সিসকোতে থাকাকালীন আগে থাকতেই এই ভূমিকম্পটা ধরতে পেরেছিল। আর এই সুদূর মহাকাশে চাঁদের জগতে আমার এক অর্দ্ধচেতন মন আমাকে সাবধান করে দিলো। তবুও কখনও কখনও আমার মনে হয় যে আমায় এভাবে বাঁচানোর জন্য লাইকাই অন্তর থেকে কোন গোপন সংকেত-বার্তা পাঠিয়েছে। কিন্তু যখন আমি সচেতন অবস্থায় সাধারণ বিচার-বুদ্ধির অধীন থাকি, তখন মনে হয় আমার এই কল্পনা নিছক লাইকার প্রতি আমার অফুরন্ত ভালোবাসার প্রতীক। তাই এর স্থান নিছক কল্পনার রাজ্যেই, বাস্তবের যুক্তিসিদ্ধ মনের সঙ্গে এর কোন সংযোগ থাকতে পারে না। কেননা, যে পৃথিবীতে লাইকার অবস্থান তা

অতিক্রম করা লাইকার মতো কোন ক্ষুদ্র প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়, মানুষের পক্ষেই তা অসম্ভব।

মনের মধ্যে এমন একটা যুক্তিসিদ্ধ কারণ খাড়া করেও কেন জানি না মনের গভীরে আমি তুষ্ট হতে পারলাম না। কি এক বেদনার বশবর্তী হয়ে আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করতাম আমার এই রঙিন স্বপ্নটাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য, স্বপ্নের ভেতর লাইকার ভালোবাসার উন্মাদনা উদ্‌গ্রীব ছুজোড়া চোখ আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে —যে ভালোবাসা এই সুবৃহৎ পৃথিবীর যে কোন পণ্যের বিনিময়ে আমার পক্ষে কেনা অসম্ভব ছিল।

[চার]

কাহিনীর প্রথম দৃশ্য

রিও, রিওডি জেনিরোর শহরতলী।

তখন মধ্যাহ্নের প্রখর উত্তাপ। পথ জনশূন্য প্রায়। বেওয়ারিশ লোমওঠা কুকুরগুলো ইতস্ততঃ ঘুরছে। লম্বা জিভ বের করে লাল ফেলতে ফেলতে সন্ধান করছে একটি ছায়ানিবিড় আশ্রয়ের। ক্লান্ত পথচারীরা ভীড় করেছে পথ পার্শ্বের কোকাকোলার দোকানে। শীতল পানীয়তে শান্তি খুঁজছে তারা। উত্তাপ লেগেছিল ঘোড়ামুখোর শরীরেও। মধ্যাহ্নের উত্তাপ থেকে শরীরের উত্তাপ আরও বেশি। দেহের রোমে রোমে শিরায় শিরায় উত্তেজনার অসহ্য কামনা। আগুন জ্বালা অনুভূতি।

সিনোরিনার দোহারা নরম শরীরটা যেন এক আশ্চর্য জগৎ। সনোরিনার গোলাপী পাতলা ঠোঁট যেন অম্লমধুর সান্ত্বনা। সিনোরিনার বিশাল নিতম্ব যেন মধুময় প্রশান্তি।

ঘোড়ামুখো সিনোরিনার ঠোঁটে আলতো করে চুমু দিতে দিতে ওর মাংসল বুকে হাত রাখলো। কেঁপে উঠল সিনোরিনা। ঘেমে নেয়ে উঠছে যেন। ব্রেসিয়ারটা ফাঁসের মত চেপে বসে আছে নরম মাংসের ওপর।

ঘোড়ামুখো দুহাতে আলতো করে তুললো ওকে বিছানার ওপর। সিনোরিনা কাৎ হয়ে উঠে বসল। হাসল মৃদু। তারপর হাত দুটো ভাঁজ করে, পিছনে নিয়ে টুক করে খুলে ফেলল ব্রেসিয়ারের হুকটা। দেহ থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ল ওটা কোলের ওপর।

ঘোড়ামুখো দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে। দুজনের ঘামে ভেজা শরীর পিছলে যাচ্ছে বার বার। ঘামে ভেজা ঠোঁটের লোনা স্বাদ পাগল করে তুলল ঘোড়ামুখোকে।

ওর অবাধ্য হাতটা ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগল সিনোরিনার শরীরের অলিতে গলিতে। বুক থেকে পেটে, তারপর নাভী, তারপর আরও নীচে চঞ্চল হয়ে ঘুরতে লাগল ওর হাত।

তারপর একসময় এক হেঁচকা টানে সিনোরিনার অন্তর্বাসটা টেনে নামাল সে। আঁতকে উঠল সিনোরিনা। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। দুহাত দিয়ে দ্রুত ঢেকে ফেলল তার গোপনতম লজ্জাটা।

ঘোড়ামুখো আনন্দ পেল ভীষণ। সিনোরিনার অকৃত্রিম লজ্জাটুকু ভাল লাগল। ওর গালে চিমটি কেটে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। শার্ট প্যান্ট ছেড়ে টেবিলের ওপর থেকে হুইস্কির বোতল নিয়ে দুটো গ্লাসে ঢাললো।

—এস, হুইস্কি খেয়ে নি।

—এই গরমে হুইস্কি !

—এস না।

সিনোরিনা নিজের ঘামে সিক্ত নগ্ন দেহের দিকে তাকাল। সংকোচ করল। দ্বিধার মত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, এই অবস্থায় ?

—তাতে কি, এস।

সিনোরিনাও উঠল, একটা গ্লাস নিল হুইস্কি। চুমুক দিল তাতে। কপালের ঘাম গড়িয়ে পড়লো হুইস্কির গেলাসে। হাসলো ঘোড়ামুখো। হাসল সিনোরিনা।

ওদিকে তখন দুটো সাদাকালো ফোর্ড মার্কারী পুলিশ গাড়ী শব্দ না করে জনশূন্য রাস্তা পেরিয়ে এসে থামল কোকাকোলার দোকানটির সামনে। ড্রাইভারের পাশের হোঁৎকা লোকটি মাথা ঘুরিয়ে তাকাল দোকানদারের দিকে। দোকানদার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল নীরবে। গাড়ী দুটো মন্থর গতিতে চলতে শুরু করলো পুনরায়। তারপর থামল একসময়। নিঃশব্দে দরজা খুলে নেমে এলো সকলে। দু গাড়ীতে মোট আটজন। প্লেন ড্রেস। চেষ্টার হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করল প্রত্যেকে।

দুজন লুকিয়ে থাকল আড়ালে। দুজন গাড়ীর পাশে বাকী চারজন এগিয়ে গেল সামনের বাড়িটার প্রাঙ্গণে, গিয়ে সদর্পে লাথি মারল দরজাটায়। চেঁচিয়ে বলল, ওপেন আপ, বাস্টার্ড হর্সফেস। উই আর টু কিল ইউ।

ঘোড়ামুখোর হুইস্কি তখন অসমাপ্ত। সিনোরিনার নগ্ন শরীরটা পাঁজাকোলা করে তুলে ওর ঢেউতোলা বক্ষের বুকে নাক ঘষতে ঘষতে বিছানার দিকে এগুচ্ছিল।

বাইরের চীৎকারে যেন ইলেকট্রিক শক্ খেল ঘোড়ামুখো, সিনোরিনাকে ছেড়ে দিল অজান্তেই। মেঝেতে ধপাস করে পড়ল সিনোরিনা। ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠল।

কিন্তু সেদিকে দেখার সময় নেই ঘোড়ামুখোর। ছুটে গিয়ে প্যাণ্টের পকেট থেকে সিক্সকাট রিভলবারটা বের করে নিয়ে জানালার পাশের গুলঘুলি দিয়ে তাক করে গুলি চালাল সে।

বাইরের চারজনের একজন চীৎকার করে কাঁধ চেপে বসে পড়ল মাটিতে বাকী তিনজন মুহূর্তে সেলটার নিল আড়ালে। মটরের

পাশের দুজন ততক্ষণে ব্রেনগান বের করে ফেলেছে। শিলাবৃষ্টির মত এক ঝাঁক গুলির বৃষ্টি হল জানালার ওপর।

ঘোড়ামুখো আন্দাজে গুলি চালাল পর পর তিনটে। কিন্তু মিস করল সবগুলো। গাড়ীর বনেটে লাগল মাত্র। আরও এক পশলা গুলিবৃষ্টি হল ওর জানালার উপর। শত শত সিমেন্টের টুকরো ইস্প্লিন্টারের মত এসে বিঁধলো ঘোড়ামুখোর শরীরে। ঘোড়ামুখো বেপরোয়া হয়ে উঠল। দৌড় দিয়ে ফিরে গেল প্যান্টের কাছে। না সেখানে আর বাড়তি গুলি নেই। দুটোই মাত্র গুলি সম্বল।

বাইরে তখন হাত মাইকে ঘোষণা করছে—হর্সফেস। ফর ইউর ইনফরমেশন। উই আর এনাফ মেন হিয়ার। সারেণ্ডার এ্যাট ওয়ান্স। আই রিপিট সারেণ্ডার।

—দাঁড়াও শ্যালা সারেণ্ডার করছি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল ঘোড়ামুখো তারপর ঘুলঘুলি দিয়ে মাইক তাক করে গুলি চালাল একটা। গুলিটা সরাসরি গিয়ে লাগল মাইকে। ছিটকে পড়ল মাইকটা হাত থেকে।

কিন্তু অপর দিক থেকে নতুন আরেকটা মাইকে আর একজন বলছে, হর্সফেস। ডু ইউ ওয়ান্ট টু ফাইট রিয়েলি? দেন উই উইল ব্লো আপ ইওর হাউস। হর্সফেস ইউ বেটার সারেণ্ডার। উই উইল কনসিডার ইওর কেস।

রাগে, বিদ্বেষে উত্তেজনায় ঘোড়ামুখো নিজের হাত কামড়াল পশুর মত। রিভলবারটার দিকে তাকিয়ে দুঃখ হল তার। নিজেরই দোষ। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে গত তিনদিন থেকে মাত্র একটা রিভলবার সম্বল করে। একটা ব্রেন বা টমিগান থাকলেও চলত।

সিনোরিনা ভয়ে মেঝে কামড়ে পড়েছিল এতক্ষণ। মাইকের আশ্বাস বাণী শুনে দুহাতে ভর দিয়ে হামা দিয়ে আসল ঘোড়ামুখোর সামনে। বলল, ডার্লিং সারেণ্ডার করনা কেন। ওরা তোমার ক্ষতি করবে না। আমি বলছি, ক্ষতি করবে না।

সিনোরিনার সান্ত্বনা বাক্যে হাসল ঘোড়ামুখো। পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল সিনোরিনার নগ্ন যৌবনের দিকে। কিন্তু না সে যৌবন আর তাকে মাতাল করল না। সে যৌবন তাকে উত্তপ্ত করল না। সিনোরিনার চোখে ভয়ের ছায়া। সে ছায়া সংক্রামিত হল ঘোড়ামুখোর অন্তরেও।

—"সারেণ্ডার করব তাই না।" বিচলিত ঘোড়ামুখো অদ্ভুত করে হাসল। "ওরা আমার ক্ষতি করবে না, তাই না"। তারপর রিভলবারটা সিনোরিনার কপাল বরাবর তাক করে গুলি করল সে। তার শেষ গুলি।

সিনোরিনার কপালে বিরাট একটা রক্তাক্ত টিপ দেখা দিল। সন্ধ্যার সূর্যের মত। টাটকা রক্ত গড়িয়ে পড়ল সেখান থেকে। সম্পূর্ণ দেহটা কেঁপে উঠল বার কয়েক। তারপর ধ্বংস স্তুপের মত অলস ভাবে মেঝের উপর পতন হল নগ্ন মাংসল শরীরটার।

ঘোড়ামুখো রসিয়ে দেখল সম্পূর্ণ দৃশ্যটা। তারপর অমানুষিক স্বরে চিৎকার করে বলল, আই উইল সারেণ্ডার!

কাহিনীর দ্বিতীয় দৃশ্য

প্যান আমেরিকান হাইওয়ের নির্জন পরিবেশ। হাইওয়ের পাশের উন্মুক্ত প্রান্তর। হাইওয়েতে পূর্বকল্পিত ছুটো মার্কারি কার দাঁড়িয়ে।

হাইওয়ে থেকে শ' তিনেক গজ দূরের পরিষ্কার মাঠটায় দাঁড়িয়ে সকালের আট ব্যক্তি। একজনের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গলায় ফিতে দিয়ে ঝুলছে। প্রত্যেকের হাতেই রিভলবার। ওদের পায়ের কাছে উবু হয়ে শুয়ে ঘোড়ামুখো। নগ্ন শরীর, হাত ছুটো পিছমোড়া করে বাঁধা। আসন্ন ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে করুণ স্বরে প্রাণ ভিক্ষা চাইছে সে। কিন্তু লোকগুলির অন্তরে দয়ামায়ার মত নমনীয় ভাব আছে বলে মনে হল না। দলপতি গোছের একজন ঘোড়ামুখোর ছটফটানি লক্ষ্য করে নীরবতা ভাঙ্গলেন, 'ওয়েল জেণ্টেল ম্যান, আজকের নায়ক ঘোড়ামুখো। চার্জ - চোরাচালানি, খুন এবং অবলা নারী ধর্ষণ।

সুতরাং দেশের কল্যাণ আমাদের উচিত তাঁকে হত্যা করা। জেণ্টেল ম্যান, ফায়ার।

আটটি রিভলবার গর্জে উঠল একই সঙ্গে বাতাসে সে ধ্বনি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। ঘোড়ামুখোর শরীরটা ঝাঝড়া হয়ে গেল, এক পলকে, প্রবল একটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল সে চিরজীবনের মত। জঘন্য কোন নতুন পাপের নায়ক হবে না আর।

হকানীর তৃতীয় দৃশ্য

রিও সাও পোলোর দৈনিক ও সাপ্তাহিক অফিস। সময় মধ্যরাত্রি। হঠাৎ করে ফোন বেজে উঠল ঝনঝন করে।

রিওতে বলল, রোজ বলছি।

সাও পোলোতে বলল, ভয়েস বলছি।

কুখ্যাত ডাকাত এবং গ্যাংষ্টার হর্সফেস বা ঘোড়ামুখো মৃত। অমুক জায়গায় লাশ পড়ে আছে। এবং দিস ইজ ডান বাই দি ডেথ স্কোয়াড পার্টি।

পরদিন ব্রাজিলের সবগুলো কাগজে এই হত্যার খবর বেরুল। সাথে রহস্ত জনক ডেথ স্কোয়াড পার্টি সম্পর্কে সম্ভাব্য সকল প্রকার মতামত। জনসাধারণ গভীর শ্বাস নিল আরেকজন কুখ্যাত ডাকাতের মৃত্যুতে। শ্রদ্ধাবনত হয়ে দীর্ঘায়ু কামনা করল স্কোয়াডের সদস্যদের।

দর্ঘজীবি হও সোনার বাছারা।

অথচ ডেথ স্কোয়াড কোন সরকারী অনুমতি সম্পন্ন পুলিশ বাহিনী নয়। স্বয়ং পুলিশ বাহিনীর অভ্যন্তরে আর এক পুলিশ বাহিনী। মিলটন লিকক ডি অলিভারার মৃত্যুর পর গড়ে উঠেছিল এই স্কোয়াড। এসকোয়াড্রাও মোর্টে বা ডেথ স্কোয়াড। মিলটন অলিভারা ছিল ব্রাজিলের জারজের পুলিশ অফিসার। ন্যায় ও আইনের সমর্থক মিলটন অলিভার কতগুলো গ্যাংষ্টারের হাতে মৃত্যুবরণ করার পরই

ব্রাজিলীয়ান পুলিশ ক্ষেপে যায়। ক্ষেপে গিয়ে স্বহস্তে গ্রহণ করে দেশের আইন কানুন।

সৃষ্টি হয় "ডেথ স্কোয়াড" পার্টির। নর-কঙ্কালের চিহ্ন সম্বলিত গাড়ী নিয়ে টহল দিয়ে ফেরে তারা শহরের আনাচে কানাচে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে পথে, ঘাটে, সিনেমা, রেঁস্তোরায় সন্দেহজনক কাউকে পেলেই তল্লাসী শুরু করে দেয়। গ্যাংষ্টার গুণ্ডা, ডাকাত, ব্যাঙ্কলুটকারী, গাড়ীচোর, চোরাকারবারী সব মাথায় হাত দিয়ে বসে। কেননা ডেথ স্কোয়াডের আইন সাধারণ দেশীয় আইন অপেক্ষা নির্মম। ডেথ স্কোয়াডের শাস্তি আদালতের শাস্তি অপেক্ষা নিষ্ঠুর। ডেথ স্কোয়াডের নিম্নতম শাস্তি মৃত্যু।

ব্রাজিলীয়ান জনসাধারণ চুরি ডাকাতি থেকে রেহাই পেয়ে শান্তিতে দিনযাপন করছে এখন। সরকার অপ্রত্যক্ষ ভাবে সমর্থন করছে দলটিকে। তবু চিন্তাবিদরা চিন্তিত। তাঁরা মনে করেন, রক্তের স্বাদ লোনা। আইনের খাতিরে নরহত্যা এক ভিন্ন প্রকৃতির খুন। ক্ষমতা হিংস্রতা ও লোভ সৃষ্টি করে। ডেথ স্কোয়াডের সদস্যরা পাছে না অর্থের বিনিময়ে নিজেদেরও বিলিয়ে দেয়।

[পাঁচ]

উত্তর ক্যারোলিনার সীমান্ত শহর ফারেটভাইল।

শহরের সীমানা ছাড়ালেই স্বরু হয়েছে দক্ষিণ ক্যারোলিনা। দু' অঞ্চলের পুলিশী সংস্থা আলাদা—তবে খুন খারাপি হলে দু'-সংস্থা মিলে খুনীকে পাকড়াও করে। খুনীরাও খুব এলেমদার। সীমানা পার হয়ে অবাধে যাতায়াত করে গাড়ী হাঁকিয়ে;

উনিশ শ' বাহাত্তর সাল।

চব্বিশে জুন—শনিবার। অপরাহ্নবেলা।

ফরেটভাইল শহরের পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ফোনটা ঝন ঝন করে বেজে উঠল।

অন ডিউটি অফিসার ফোন তুলে নিল।

কিন্তু চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সোজা হয়ে বসল।

তুমি বলছ, কে বা কারা দু'জন যুবতীকে গুলী করেছে? জানতে চাইল অফিসার।

হ্যাঁ। এবং তারা দুজনই মারা গেছে।

কোথা থেকে কথা বলছ? শহর সীমানার কাছাকাছি পুরোনো ৩০১ নম্বর রুদ্ধপথের একখানা বাড়ি থেকে কথা বলছ? কাছেই একটা গীর্জে আছে?

সংবাদদাতা হ্যাঁ সূচক জবাব দিল।

অফিসার বলল—তুমি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাক। আমি কাউকে না কাউকে পাঠাচ্ছি। দেখ, ঘরের কোনও জিনিসে হাত দিও না। কাউকে যতক্ষণ না পাঠাতে পারি ওখানে অপেক্ষা করো।

পুলিশ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডারল্যাণ্ড কাউন্টির শেরিফের দপ্তরে ফোন করল।

ডিটেকটিভ সারজেন্ট ড্যানি মার্টিন ঘরে বসে একখানা ফাইলের পাতা উল্টাচ্ছিল, ফোন তুলে নিল।

শহর পুলিশ এইমাত্র খবর পাঠিয়েছে রোবসন কাউন্টির সীমানায় দুটো মেয়ে খুন হয়েছে। দুজন তদন্ত করতে যাচ্ছে। ওরা বাড়িখানার উপর নজর রাখবে।

ড্যানি মার্টিন বলল—দেখ, ওরা যেন কোন জিনিসে হাত না দেয়।

ড্যানি মার্টিন ফোন ছেড়ে দিল।

রাত সাড়ে নটা।

ডিটেকটিভ মার্টিন এবং মনরো বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের বড় কর্তা ডিটেকটিভ লেফটেন্যান্ট রিচার্ড ওয়াশবার্ন ওখানে হাজির হল। গাড়ী থেকে নামল লেফটেন্যান্ট।

মার্টিন বলল—মনে হচ্ছে, সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

ওরা সাজানো গোছানো শোওয়ার ঘরে ঢুকল। আধুনিক বিলাস বহুল একখানা ঘর। এ ঘরে যারা থাকে তারা নিঃসন্দেহে অর্থবান এবং অমিতব্যায়ী।

দামী খাটে বিছানা এবং সেই বিছানার ওপর শায়িতা ছুটি নারীর মৃতদেহ। পাশাপাশি ছুটি দেহ উপুড় করে শোয়ানো। তাদের হাত ছুখানা ও কব্জি এমনভাবে রাখা যেন ওদের কেউ খুন করার আগে বেঁধেছিল। এবং ঘটনাটা ঘটেছে অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা আগে।

লেফটেন্যান্ট মৃতদেহ ছুটো স্পর্শ না করেই নীচু হয়ে পরখ করল। মাথার পিছন দিকে রক্ত জমে আছে। খুনী ছুটি যুবতীরই মাথায় গুলি করেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। খুনী ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে খুন করেছে– তাই মোক্ষম আঘাত হানতে ওর অসুবিধে হয় নি।

যুবতী ছুজন দেখতে খুব সুন্দরী।

একজনের বয়স বছর কুড়ি হবে--অন্য জন কিছু বড় বয়সে। প্রথম যুবতী স্বর্ণকেশী, বেশ পরিপাটি করে বিনুনি করা। এক গোছা চুলও বিন্যস্ত নয়। তার পরনে বিকিনি প্যান্টি আর লেস দেওয়া নাইট গাউন। ডান হাতের কব্জিতে মুক্তো বসানো ব্রেসলেট। যুবতীর গলায় হয়ত হারও ছিল। দ্বিতীয় জনের পরনে প্যান্টি আর সার্ট— মাথা ভর্তি কালো চুল। দেহের গড়ন মজবুত। ওর রঙ করা নখগুলো লম্বা - হাতে বড় বড় মুক্তোর ছুটো আংটি।

যুবতী ছুজনের দেহ বিছানায় শায়িত। বামদিকে মুখ ফেরানো। কিন্তু বিছানাটা একটুও অগোছালো নয়। ওদের মাথার কাছে একখানা ভাঁজ করা খবরের কাগজ আর একগাছা দড়ি পাকানো বাণ্ডিল বাঁধা—ব্যবহার করা হয়নি।

লেফটেন্যান্ট ওয়াশবার্ন ঘরের চারিধার খুঁটিয়ে দেখল। না, কোথাও এতটুকু অগোছালো ভাব নেই। আর ঘরখানার এমনি ধরনের স্বাভাবিক আর সুন্দর পরিপাটি অবস্থা দেখে খুনের ঘটনাটা আরও কুৎসিৎ মনে হচ্ছে।

বিছানার উপর সাটিনের বালিস, দামী দামী বিলাস দ্রব্য। বিছানার পাশে একখানা সোজা পিঠ চেয়ার অবশ্য বসার জন্য নয় – এখানে যে সব পুরুষরা আনন্দের খোঁজে আসে তারা পোশাক ছেড়ে রাখে চেয়ারের উপর।

সহসা ওয়াশবার্ন ভুরু কোঁচকাল। যেন ভুলে যাওয়া কোনও কথা মনে পড়ল। ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল আচ্ছা, এই যুবতী উইলমা নরিস না ?

মার্টিন ঘরের মধ্যে ঢুকে বলল—যে ছোকরা খুনের এজাহার দিয়েছিল সেও তাই বলছিল। উইলমা নরিস এই ব্রথেল চালাত।

ছোকরা কে ?

উইলমার বয় ফ্রেণ্ড। স্যার, আপনি আসবার আগে ওর সাথে কথা বলছিলাম।

ঘরখানার ভিতর শেষ বারের মতন একবার চক্কর দিয়ে ওয়াশবার্ন অফিসারদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল – এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্রাইম-ল্যাব বিশেষজ্ঞরা এসে হাজির হল।

ঘণ্টা চার ধরে ডিটেকটিভরা সারা ঘর এবং ফ্ল্যাণ্ট তন্ন তন্ন করে খুঁজল। তদন্তে দুটি মাত্র বস্তু পাওয়া গেল।

প্রথম একখানা ছোট কাল খাতা—আর সেই খাতায় লেখা রয়েছে শ' খানেক লোকের নাম, ঠিকানা আর তারিখ। কয়েকটা নামের পাশে তার টেলিফোন নম্বর লেখা রয়েছে।

সংবাদদাতা টমাস ওয়েলসের কাছ থেকে জানা গেল যুবতী দুজনের পরিচয়। উইলমা গ্রেস নরিস সাইত্রিশ বছরের যুবতী। অপর যুবতী লিণ্ডা লিঙ্গল বয়স তেইশ। এরা দুজনেই নগর বধূ—দেহ পসারিনী।

ঘরের বিলাস বহুল ব্যবসা, সোজা পিট চেয়ার এসব দেখেই পুলিশের পক্ষে আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় নি এটা ব্রসেল। আর ব্রসেলের মেয়ে যখন তখন এদের অতীত সম্পর্কে কোনও না কোনও ইতিহাস পুলিশের খাতায় থাকতে পারে।

তাছাড়া উইলমা নরিস যুবতীটির নাম লেফটেন্যান্টের কাছে অজানা নয়। ওকে কোথায় যেন দেখেছে। একটা আপত্তিকর ঘটনার সঙ্গেও ওর নাম জড়িত ছিল।

* * *

হেড কোয়ার্টারে ফিরে লেফটেন্যান্ট পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে লাগল।

হ্যাঁ, একসময় কেসটাও পাওয়া গেল।

প্রায় এক বছর আগের ঘটনা। কাউন্টির দক্ষিণ পাড়া থেকে একদল লোক অভিযোগ করেছিল—ভদ্রপাড়ার মধ্যে ব্রসেল অর্থাৎ বেশ্যালয় গড়ে উঠেছে। এবং এই ব্রসেলের মালিক উইলম নরিস নামে একটি যুবতী। প্রায়ই পানোন্মত্ত সমাজ বিরোধীরা রাত্রে এই বে-আইনী বেশ্যালয়ে এসে হামলা করে।

এই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ উইলমা নরিসের এই বাসায় তদন্ত করতে গিয়েছিল। লেফটেন্যান্ট তখন ছিল তদন্তকারী অফিসার। উইলমা নরিসের বেশ্যাবৃত্তির কোনও প্রমাণ সেদিন পাওয়া যায় নি। ঘরের অবস্থা এবং হাবভাব দেখেও মনে হয় নি যুবতী একজন নগর বধূ।

তবু তাকে ধমক দিয়ে বলেছিল লেফটেন্যান্ট—দেখ মিস নরিস, তোমার সম্পর্কে লোকেরা অভিযোগ এনেছে। সাবধান, এই ধরনের বে-আইনী বেশ্যাবৃত্তি করা চলবে না। যদি ওই কাজ করতে চাও ত অন্য জায়গা দেখে নাও। আমার এলাকায় ওসব চলবে না।

উইলমা নরিস সেদিন কিছু বলেনি। দাঁতে নীচের ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অবশ্য উইলমা নরিস ওই পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

একজন অফিসারের সঙ্গে টমাস থেলস ঢুকল লেফটেন্যান্টের ঘরে।
স্যার, ইনিই খুনের এজাহার দিয়েছিলেন থানায়। অফিসার বলল।
ফাইল থেকে মুখ তুলে বলল লেফটেন্যান্ট ওয়াশবার্ন -- বসুন।
টমাস থেলস খুব সপ্রতিভ ছোকরা · পোশাকে আচরণে সে খুব চালাক। বসল।

আপনি উইলসন নরিসকে জানেন?
হ্যাঁ।

কতদিন ধরে জানেন? আপনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

বছর দুয়েক হল উইলমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। ও ছিল আমার গার্ল ফ্রেণ্ড।

আচ্ছা ঘটনার দিন আপনি কোথায় ছিলেন?

আগের দিন রাত্রে মানে বৃহস্পতিবার এই বাড়িতে উইলমার সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। সকালে উঠে শহরের বাইরে ব্যবসার কাজে গিয়েছিলাম। শনিবার রাতে আমার এখানে ফেরার কথা ছিল।

শনিবার সকালে বার কয়েক উইলমাকে ফোন করেছিলাম।
কেউ ফোন ধরেছিল?

না। কেউ ধরেনি ফোন। সন্দেহ হল। এমন ত হয় না। আর সকালে উইলমা যায় না কোথাও। তবে ফোন ধরল না কেন? তাই ত ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত করে চলে এলাম।

তারপর? এসে দেখলেন উইলমা খুন হয়েছে, তাই না?

হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলাম থানায়। বলল, টমাস কোনও জিনিসে হাত দেয়নি ত?

না। কেবল ফোনে হাত দিয়েছিলাম ফোন করবার জন্য। ও লিণ্ড লিঙ্গলকে?

হ্যাঁ, চিনি। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল লিণ্ডার। ও ছিল ষ্ট্রীট গার্ল। নিজস্ব কোন ঘর ছিল না। ব্রেজিল থেকে এসে এখানে ব্যবসা করে। মেয়েটা খুব ভাল। আমি ওকে উইলমার ব্রসেলে নিয়ে এসেছিলাম।

ওর বয় ফ্রেণ্ডদের চেনেন ?

না। লিণ্ডারের তেমন কোন বয় ফ্রেণ্ড নেই। সন্ধ্যার পর ওর কাছে যারা আসত তারা ছিল ওর সাময়িক শয্যাসঙ্গি।

আচ্ছা, আপনি যখন এলেন তখন কি ঘরের দরজা খোলা ছিল ?

না। দরজা বন্ধ ছিল। উইলমা আমাকে ঘরের একটা চাবি দিয়েছিল।

সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকেছিলাম।

লেফটেন্যাণ্ট ইঙ্গিত করল—মিস্টার ওয়েলসকে এখন নিয়ে যাও।

মার্টিন জানতে চাইল—ওকে কি ছেড়ে দেব, স্যার ?

না, মনে হচ্ছে ওয়েলস সত্যি কথা বলছে। তবে ওকে একটু ঘুমুতে দাও। তারপর আর একবার ওকে বাজিয়ে দেখব। ভুলে যাওয়া কিছু কিছু ঘটনা হয়ত আজও আমাকে বলবে। এখন এই ছোট খাতায় যাদের নাম লেখা আছে সেগুলো আবার পরীক্ষা করা যাক, কি বল মার্টিন !

হ্যাঁ, স্যার !

পাতা উল্টোতে উল্টোতে লেফটেন্যাণ্ট অনেকগুলো নাম দেখতে পেল। অনেক নাম আর অনেক ঠিকানা। এদের সঙ্গে নিশ্চয় উইলমার পরিচয় ছিল। এবং একজন নগর বধূর সঙ্গে কখন পুরুষরা সম্পর্ক স্থাপন করে ? যখন সেই পুরুষরা হয় তার রাতের শয্যাসঙ্গী। কোন না কোন সময় বা একাধিকবার উইলমার ব্রসেলে এসেছে। হয় তার সঙ্গে অথবা ব্রসেলের অন্য কোনও সুন্দরীর সঙ্গে দেহ মিলন ঘটিয়েছে। জীবন মনের উপচানো ফুর্তির ফেনায় নেশাগ্রস্ত হয়েছে। ফিরে গেছে নিজের নাম ঠিকানা রেখে আসতে। ফিরে ফিরে আসবে প্রাণবন্ত একটি সুন্দরীর দেহ উপভোগের আশায়। এই নামের অধিকারীদের সঙ্গে কথা বললে হয়তো এমন কিছু পাওয়া যাবে যা থেকে এই খুনের কিনারা ধরাও হবে সহজ।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে খাতার পাতার পর পাতা উল্টায় ওয়াশবার্ন।

এই ত এই নামের তালিকায় শহরের নামী দামী অনেকের নাম ঠিকানা রয়েছে। এমন কি কয়েকজন পুলিশ অফিসারের নামও রয়েছে। তবে কি এরাও ছিল উইলমার ব্রসেলের অভিসারক? নটির হাটের ক্রেতা। এদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে ত শহরময় একটা টি-টিক্কার পড়ে যাবে!

কাল খাতা টেবিলে সরিয়ে রেখে বলল ওয়াশবার্ন—তোমাদের কেউ একজন নামগুলো বেছে একটা তালিকা তৈরি কর। ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

তারপর মাথার পিছনে ছু' হাত রেখে চেয়ারে আরাম করে বসল। মাথায় এখন চিন্তার মাকড়সারা জাল বুনছে। এই জোড়া খুনের কিনারা করতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। খুনী ঘরের মধ্যে কেবল একটা মটেলের চাবি ছাড়া আর প্রায় কিছুই রেখে যায় নি। হাতের ছাপ? না তাও পাওয়া যায় নি? পেশাদার খুনী। হয়ত রবারের দস্তানা পরে খুন করেছে। কিংবা নষ্ট করে গেছে সব চিহ্ন। আর ওই মটেলের চাবি? ওটাত ওর নাও হতে পারে। উইলমার নিজেরও চাবি হতে পারে। কোনও মটেলে হয়ত কোনও দিন নিজের গাড়ী রেখেছিল। চাবিটা আর মটেলের মালিককে দেয়নি। তবু চাবিটা একটা সূত্র।

এ ছাড়া আরও ছুটো কাজ রয়েছে হাতে।

কাল খাতায় লেখা নামের তালিকা অনুযায়ী উইলমার অনুরাগীদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। নগরবধূও সেই খুনীর—শিকার হয়ে জীবন দেয়। ঘটনা যদি তেমন হয় তবে এই সব পুরুষ অনুরাগীদের কাছ থেকে তার আঁচ পাওয়া যাবে।

লিণ্ডা হয় ত খুন করতে দেখেছিল। কিংবা খুনী তার খুব পরিচিত।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে অনেক সাপ বেরিয়ে আসে। হয় ত এই ব্রসেলের খুন রহস্য ভেদ করতে গিয়ে আরও অনেক রহস্যের সন্ধান

মিলবে। হয়ত অনেক নামী দামীরা জড়িয়ে যাবে। তা যাক। তবু খুনীকে খুঁজে বার করবে পুলিশ দপ্তর।

এছাড়া আরও একটা কাজ করবে পুলিশ দপ্তর। শহরে আরও যে সব নগরবধূ আছে তাদের সঙ্গে দেখা করবে পুলিশ। নগরবধূদের অনেকেই অনেকের সম্পর্কে খবর রাখে। এমন কি অনেক গোপন খবরও জানে। উইলমা নিজে একজন ব্রসেলের কর্ত্রী। অনেক নগরবধূ তার আশ্রয়ে থেকে দেহদানের ব্যবসা অতীতে করেছে। তারা জেনেছে উইলমার ব্রসেলের সব কথা। তাদের কাউকে খুঁজে বার করতে পারলে পুলিশ উইলমার গোপন খবর জানতে পারবে।

দেখ মার্টিন। সোজা হয়ে বসে বলল ওয়াশবার্ন।

ইয়েস লেফটেন্যান্ট।

শহরের ব্রসেলের আর সেখানকার নগরবধূদের তালিকা আছে?

আছে। তবে অনেক বে-আইনী ব্রসেলও আছে। তাদের তালিকা পুলিশ তৈরি করতে পারবে কয়েকদিনের মধ্যে।

ওয়াশবার্ন উঠে পড়ে বলল—তালিকাটা তৈরি করাও।

পুলিশ অফিসারদের ধারণা খুনের তুটো মোটিভ থাকতে পারে।

প্রথম মোটিভ রবারি। লুঠ। নিহত যুবতীর দেহ থেকে জুয়েলারি এবং ঘরে রাখা সব অর্থ লুঠ করে নিয়ে যাওয়া। ব্রসেলের মালিক হিসেবে উইলমার ভাল অর্থ রোজগার করত। তার বয় ফ্রেণ্ড টমাস ওয়েলস বলেছে, উইলমার একটা জুয়েলারি খচিত দামী হাত ঘড়ি ছিল। সেটা সব সময় তার কব্জিতে বাঁধা থাকত। তার দাম প্রায় তু'হাজার ডলার। আর উইলমা গলায় পরত এক ছড়া মূল্যবান সোনার হার। কিন্তু ঘরে তদন্তের সময় এ তুটো জিনিসই পাওয়া যায় নি। নিশ্চয় খোয়া গেছে।

টমাস আরও বলেছে, উইলমার কাছে সব সময় প্রচুর খুচরো মুদ্রা

থাকত। ব্রসেলের ব্যাবসা সুষ্ঠুভাবে চালাবার জন্য এই পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত। কেননা ওর ব্রসেলে রোজ সন্ধ্যায় আসত ধনী কাস্টমাররা। তারা সবাই ছিল উইলমার পরিচিত আর নয়ত কোনও পরিচিত নগরবধূ তাকে উইলমার ঘরে নিয়ে আসত। এই সব ধনী কাস্টমাররা চেক দিত প্রায়ই এবং উলমাকেই এই সব চেক ভাঙিয়ে রেডি মানি দিতে হত।

তুমি ঠিক জান ত যে উইলমার কাছে ভাঙানো ডলার থাকত।

হ্যাঁ, আমি নিজেই কতদিন প্রয়োজনে ওর কাছ থেকে চেক ভাঙিয়ে নিয়েছি। কিন্তু ঘর তল্লাসি করার সময় উইলমার ঘরে কোনও অর্থ পাওয়া যায় নি। এমন কি উলমার নার্সটাও নিখোঁজ। এত বিলাস ব্যবসার মধ্যে যারা থাকত তারা তাদের দেরাজে বা আলমারিতে কেন একটিও ডলার নেই? কেন নেই একটাও নার্স বা হাতব্যাগ? উপরন্তু ওয়ার্ডরোবে পোষাক ঝুলিয়ে রাখার জায়গাটার বেশ কিছু অংশ ফাঁকা। দেরাজের মধ্যে রাখা পোষাকগুলোও এলোমেলো। দেখে মনে হয়েছিল, কেউ যেন ওগুলোর মধ্যে কিছু খুঁজেছে। তার খুব তাড়া ছিল, কিংবা সে খুব উত্তেজিত ছিল তাই দেরাজের পোষাক-গুলো আবার ভাল করে গুছিয়ে রাখার সময় পায় নি।

ওয়াশবার্ন একটা ফাইলে পাওয়া সূত্রগুলো একের পর এক একটা সাজাচ্ছিল।

বলল—খুনীর মোটিভ লুঠ করাই ছিল। হয়ত লুঠ করতে এসে বাধা পায় তাই খুন করেছে।

স্যার, যুবতীদের ধর্ষণে বাধা পেয়ে বোধ হয় খুনী দুজনকেই খুন করেছে।

মনে হয় না। ওরা ত খুন হয়েছে অপরাহ্নে চারটা থেকে পাঁচটার মধ্যে। আজও ব্রসেলে লোক আসবার সময় হয় নি। আর বিভিন্ন পুরুষের শয্যা-সঙ্গিনী হয়ে রোজগার করে তারা। পুরুষের হাতে ধর্ষণ তারা ভয় করে না। আচ্ছা ময়না তদন্তের রিপোর্ট খানা দেখি।

মার্টিন রিপোর্ট খানা আনল।

দেখ, রিপোর্টে লিখেছে যুবতীদের কেউ ধর্ষণ করে নি। উইলমার বুকে গুলির চিহ্ন। কেন? মাথার আঘাতেই ত ওর মৃত্যু হওয়ার কথা। তবে আবার বুকে গুলি করল কেন? ৩২ ক্যালিবার পিস্তল থেকে গুলি করা হয়েছে। এর অর্থ কিছু ভাবতে পারছ মার্টিন।

হ্যাঁ, খুনী খুব নৃশংস চরিত্রের। খুন করতে বা গুলি ছুঁড়তে সে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। এবং হয়ত কোন কারণে উইলমার উপর সে রেগে গিয়েছিল। তাই মৃত্যু হয়েছে জেনেও সে আবার উইলমাকে গুলি করেছে।

উইলমার সঙ্গে খুনীর তাহলে পরিচয় ছিল?

নিশ্চয়! মার্টিন জবাব দিল।

সহসা টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ওয়াশবার্ন রিসিভারটা তুলে নিল—হ্যালো, হ্যাঁ, কথা বলছি। কি বলছেন? ঘটনার দিন বিকাল সাড়ে চারটার সময় আর এক বন্ধুর সঙ্গে উইলমার ব্রসেলে ছিলেন। এবং তখন সেখানে তিনজন নগরবধ্ ছিল। উইলমা ছাড়া আর কাউকে চেনেন না। হ্যালো, আপনার নামটা কি বললেন না ত? হ্যালো। না ফোন ছেড়ে দিয়েছে। ওয়াশবার্ন রিসিভার রেখে দিল।

তৃতীয় নগরবধ্র নাম কিছু বলল?

না। তবে বলেছে মেয়েটি যুবতী আর দেখতে খুব সুন্দরী। মার্টিন, আমার কিন্তু মনে সন্দেহ হচ্ছে খুনী একজন পুরুষ।

ঐ তৃতীয় নগরবধূ অন্যদের খুন করে সব লুঠ করে নিয়ে গেছে।

না। আঘাতের বিচার করে আমি নিশ্চিন্ত যে, খুনী একজন পুরুষ। কোন নারী খুনীর পক্ষে ওভাবে দুজন সঙ্গিনীর হাত বেঁধে খুন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। হয়ত এই পুরুষটি ওই তৃতীয় নগরবধূর সঙ্গী হতে পারে।

ব্রসেলে আরও একজন যুবতী ছিল, এ সংবাদ তদন্ত প্রয়াসের

উপর নতুন আলোকপাত করল, অনুমান করা হল যে খুনী একজন বা একাধিক পুরুষ। খুনী যেন একজন স্বাভাবিক ঘাতকের মতন খুন করেছে। আর ওই খুনী কাজ শেষ করে তৃতীয় সুন্দরী নগর-বধূকে ধরে নিয়ে গেছে নিজেদের ডেরায়।

যে অফিসার মটেলের চাবি নিয়ে তদন্ত করতে গিয়েছিল সে রিপোর্ট দিল। চাবিটি এই শহরের একটি মটেলের। দক্ষিণ ক্যারোলিনার কেনেটসভাইল শহরের জি. এম. হিগনাইট ওখানে দুদিনের জন্য গাড়ী নিয়ে উঠেছিল। ছিল দুটো রাত। খুনের দিন তার মানে শুক্রবার সকালে সে মটেল ছেড়ে এসেছে। হিগনাইট সত্তর সালের ফোর্ড পিন্টো মডেলের একখানা গাড়ীর মালিক। রেজেস্ট্রি হয়েছে দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে। গাড়ীর নম্বর—এল ডি ডব্লু ১২০। লোকটি তাহলে শুক্রবার সীমানা পেরিয়ে উত্তর ক্যারোলিনাতে প্রবেশ করেছে। দু' দুটো নতুন খবর মিলেছে।

লেফটেন্যাণ্টের আদেশে আবার টমাস ওয়েলসকে আনা হল। ওয়েলস এখন শান্ত। গার্ল ফ্রেণ্ডের খুনের জন্য ওখুব বিষণ্ণ। ও চায়, খুনী ধরা পড়ুক—শাস্তি লাভ করুক। ও এখন পুলিশকে তদন্তের কাজে সাহায্য করতে খুব ব্যগ্র।

খুনের দিন উইলমার ঘরে আর একজন যুবতী ছিল। সে খুব সুন্দরী আর ছিমছাম চেহারা। এ ধরনের কোনও যুবতীকে উইলমার ব্রেসেলে দেখেছ? নাম জান তার?

সুন্দরী আর ছিমছাম চেহারার যুবতী যখন, তখন এ নিশ্চয় টনি কিমার।

চেন তাকে?

নিশ্চয়ই। ও এর আগে উইলমারের ব্রসেলে মাসখানেক ছিল। এখনও এই লাইনে আছে শুনেছি।

আচ্ছা, মেয়েটি কি নিজেই এখানে এসেছিল, না আর কেউ তাকে এনেছিল?

না। কিমারকে এখানে নিয়ে এসেছিল রজার। লোকটা থাকে দক্ষিণ ক্যারোলিনাতে। ব্রসেলে যুবতীদের নিয়ে আসা তার পেশা। আমার অবশ্য ধারণা ছিল টনি কিমার ওই রজার নামের লোকটার স্ত্রী। কিন্তু তা নয়। কদিন পরে রজার আর একজন যুবতীকে নিয়ে এসেছিল উইলমার বাড়িতে। এই যুবতীটিও সুন্দরী আর স্বর্ণকেশিনী। এবং আসলে সেই হচ্ছে রজারের স্ত্রী। কিন্তু উইলমা তার বাড়িতে জায়গার অভাবে যুবতীকে রাখে নি। রজার তাকে তখন পাইন হ্যার্ট শহরে নিয়ে গিয়েছিল। আচ্ছা শেষ কবে তুমি রজারকে দেখেছ? এবং কোথায়?

ওয়েলস বলল—রজারকে শেষবার দেখেছি উইলমার বাড়িতে বাইশে জুন বৃহস্পতিবার।

ওয়াশবার্ন মনে মনে হিসেব করলেন—হুঁ, অর্থাৎ উইলমার খুন হওয়ার আগের দিন?

আমি ট্যুরে যাওয়ার সময় দেখলাম রজারের সাথে উইলমার খুব বিবাদ হচ্ছে।

কেন?

টনি কিমারের যৌন রোগ হয়েছে। তাই উইলমা আর তাকে তার বাড়িতে রাখতে রাজী নয়। বিবাদ হলেও তা থেকে খুনোখুনি হওয়ার মতন অবস্থা হয় নি। ওয়াশবার্ন জানতে চাইল—আচ্ছা, কোথায় এখন টনিকে পাওয়া যায় বলতে পার?

ঠিক জানি না। তবে উইলমা বলছিল টনিকে, তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।

আর তাই ওয়ার্ডরোবে কিছু পোষাক উধাও হয়েছে। বলল মার্টিন।

টমাস ওয়েলস অনেক কথা বলেছে। তৃতীয় নগরবধূর নাম টনি কিমার। সে খুনের আগের দিন পর্যন্ত ছিল উইলমার বাড়িতে। সে সুন্দরী এবং তার দেহ ছিমছাম। তাঁর বন্ধু রজার। সে তাকে

ব্রসেলে এনেছিল। কিন্তু ব্রসেলের মালিক উইলমা তাকে তারিয়ে দিয়েছে কেন না টনির সুন্দর দেহে কীট প্রবেশ করেছে—সে যৌন রোগী। রজার তা মানতে চায় নি। উইলমার সঙ্গে তার তাই বিবাদ। রজার আর টনি কিমারের প্রস্থান।

এখন জানা প্রয়োজন রজার নামের লোকটি আসলে কে? সেই কি হিগ নাইট? সেই কি মটেলের চাবিটা উইলমার ঘরে ফেলে গেছে? তারই কি থেগর্ড পিন্টো গাড়ী আছে? এবং সেই কি কেনেটসভাইলে যাবে?

ওয়াশবার্ন বলল—মার্টিন তুমি মনরোকে নিয়ে কেনেটসভাইলে যাও। হিগনাইটের সব খবর নিয়ে এস। ওর ছবিও নিয়ে এস। এবং ওর অতীত কীর্তি-কলাপ যদি কিছু থাকে তবে ওখানকার কথা জানতে পারবে। খুনের তদন্ত এবার নতুন পথ নিল।

ওয়াশবার্ন একদল অফিসারকে উইলমার বাড়ির আশে পাশে খবরাখবর নিতে পাঠাল।

প্রতিবেশীরা কেউ না কেউ খুনীকে ওই বাড়িতে ঢুকতে এবং বেরোতে দেখে থাকবে।

উইলমার বাড়ির একটা খামার। চাষ হয়। জেথ্রো ওখানে চাষের কাজ দেখা শুনা করে। খেতে তামাকের চাষ হয়। সারাদিনই জেথ্রো ওখানে চাষের কাজ করে। তারপর সন্ধ্যার আগে ঘরে ফিরে যায়। মাঝে মাঝে ও চাষের যন্ত্রের উপর ভর দিয়ে বিশ্রাম নেয়। বিস্তীর্ণ খামার। একদিকে কয়েকটা বাঙলো বাড়ি। ওখানেই শহরটা শেষ হয়ে গেছে। খামারের আর একপাশে হাইওয়ে—শহর থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে ছুটেছে। মাঝে মাঝে সগর্জনে গাড়ী যাতায়াত করে হাইওয়ে ধরে।

পুলিশ অফিসাররা জেথ্রো টাইনকে কাছে ডাকল।

চাষ করার বড় যন্ত্রটা কাঁধে করেই এগিয়ে এল।

যন্ত্রটার উপর ভর দিয়ে সামনে দাঁড়াল।

এই খামারে রোজ কাজ কর? জানতে চাইল একজন অফিসার।

হ্যাঁ, এখানেই কাজ করি। জবাব দিল জেথ্রো। ওর চুচোখে বিস্ময়। এতগুলো জাঁদরেল পুলিশ অফিসার তার কাছে এসেছে কেন? কিন্তু ও ত কিছু করেনি। সারাদিন খামারে কাজ করে ঘরে ফেরে। ওর মা ওকে তাজা মুরগীর মাংস আর রুটি খেতে দেয়। তারপর বিশ্রাম নেয়। তবু ভয়ে ওর বুকটা কেঁপে উঠল। ওরা তাকে কয়েদ করবে নাকি।

শুক্রবারও সারাদিন এখানে ছিলে না কি?

হ্যাঁ, ছিলাম।

আচ্ছা, কোনও লোককে ওই বাঙলোগুলোর দিকে যেতে বা আসতে দেখেছ?

সে ত কত লোক রোজ আসছে যাচ্ছে। কার কথা বলব।

তেমন বিশেষ কাউকে দেখেছ যার কথা তোমার মনে আছে।

জেথ্রো খানিকক্ষণ নীরবে কি যেন ভাবল, তারপর বলল—শুক্রবার বিকাল বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় দেখেছি চুজনকে।

চুজনকে? কে তারা? কি করছিল?

ওদের একজন গুণ্ডার মতন দেখতে পুরুষ। আর একজন সুন্দরী নারী। বেশ ছিমছাম দেহ। ওদের হাতে স্যুটকেশ ছিল। দেখলাম ওদের দারুন তাড়া। একটু যেন অস্বাভাবিক। গাড়ী বা বিমানের যাত্রীরাও স্যুটকেশ নিয়ে এভাবে ছোটে না। ওদের তাড়া দেখেছিলাম বলে ওদের কথা আমার মনে আছে।

ওরা কি করল বলতে পার?

হ্যাঁ। ওরা নতুন মডেলের একখানা মোটরগাড়ীতে চড়ে ওই দিকে চলে গেল। গাড়ী খানার রঙ সোনালি। তবে এতদূর থেকে ওদের

মুখ ভাল ভাবে দেখতে পাই নি। ওদের দুজনেরই দেহ একই রকম লম্বা।

ময়না তদন্তের রিপোর্টে ডাক্তার বলেছে, যুবতী দু'জন খুন হয়েছে শুক্রবার পাঁচটা থেকে ছটার মধ্যে। জেথ্রো টাইনও বলেছে প্রায় ঐ সময়ই সে তাদের চলে যেতে দেখেছে। কাজেই সময়ের একটা সঠিক নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে।

মার্টিন এবং মনরো ফিরে এল কেনেসটভাইল শহর থেকে। মার্লবরো কাউন্টি পুলিশ দপ্তর জানিয়েছে হিগনাইটকে তারা শুধু জানে না, সবে খুঁজছে। লোকটার বিরুদ্ধে কয়েদ করার হুকুম নামা আছে। ওর বিরুদ্ধে লুঠ করার অভিযোগ আছে। হিগনাইট তার স্ত্রী আর ফ্লোরিডার একটি ছোকরার বিরুদ্ধে লুঠের ও জোর করে বাড়িতে ঢোকার অভিযোগ। কিন্তু মিসেস হিগনাইট ছাড়া আর কাউকে পুলিশ পায় নি। পুলিশ মিসেস হিগনাইটকে কয়েদ করে রেখেছেন। কিন্তু গত শনিবার, ব্রসেলে জোড়া খুন হওয়ার পরদিন, ভারজিনিয়া থেকে এক হাজার ডলার তাকে টেলিগ্রাম করে কেউ পাঠায় এবং মিসেস হিগনাইট সেই অর্থে বণ্ড দিয়ে মুক্তি পায় জামিনে। হিগনাইটের সোনালি রঙের ফোর্ড পেন্টো গাড়ী আছে এবং সে নগরবধূ সরবরাহ করে। সে কেনেটসভাইল শহরের কোথাও গা ঢাকা দিয়ে আছে। ওখানকার অপরাধীদের সঙ্গে ওর খুব দোস্তি। লোকটা নিষ্ঠুর এবং সশস্ত্র।

ওয়াশবার্ন সহকারীদের সঙ্গে খুনের বিষয় নিয়ে ওয়াশবার্ন পরামর্শ করল। হ্যালো কথা বলছি। সুপ্রভাত। কি বলছেন ? হিগনাইটের আসল নাম রজার ম্যারকুইন। দাগী আসামী। মিসৌরি ষ্টেটের জেলখানা থেকে পালিয়ে এসেছে। খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছিল। আরো দু' দুটো খুনের মামলা ওর মাথার উপর ঝুলছে। এখনও বিচার শুরু হয় নি। এই ভয়ানক দাগী আসামী একটা বিবাহের ব্যাপারে সাময়িক খালাস পেয়েছিল কিন্তু সে আর জেলখানায় ফিরে যায় নি। সোজা গা ঢাকা দিয়েছে। পুলিশ এখন সুনিশ্চিত যে, উইলমা নরিসের

ব্রসেলের জোড়া খুনের জন্য অপরাধী রজার ম্যারকুইন এবং তার সঙ্গিনী টনি কিমার। কিন্তু কোথায়? উত্তর ক্যারোলিনা ছেড়ে তারা মিসিসিপির পূর্বদিকের অনেকগুলো ষ্টেটে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবশেষে ফেডারেল সরকার তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করল। অপরাধীদের চেহারার বর্ণনা, তাদের গাড়ীর নম্বর সব কিছু রেডিও এবং পত্রিকায় প্রকাশ করা হল।

কয়েকদিনের মধ্যেই আরানেসাস পুলিশ রজার ম্যারকুইন এবং টনি কিমারের ছবি চেয়ে পাঠাল। ওরা টেক্সারকানা শহরের একজন বৃদ্ধা শিক্ষিকাকে গুলি করে খুন করে পালিয়ে এসেছে।, এবং মহিলার হাজার ডলার দামের ঘড়িটা লুঠ করে এনেছে।

ওয়াশবার্ন বলল— ম্যারকুইনের দামী ঘড়ির উপর খুব লোভ দেখছি।

মার্টিন বলল—মাঝে মাঝে অপরাধীরা কোনও একটা জিনিস দেখলে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। ম্যারকুইনও দামী ঘড়ি সম্পর্কে খুব লোভী।

মিসৌরি পুলিশ দপ্তর জানাল—লোকটি খুব বিপজ্জনক। আশঙ্কা হচ্ছে ওকে গ্রেপ্তার করতে গেলে কোনও অফিসারের মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়।

আগষ্ট মাসের চার তারিখ।

পেনসিলভ্যানিয়ার সমারসেট শহরের পুলিশ দপ্তরে খবর এল যে একজন লোক জোর করে একখানা ট্রাকে উঠেছে, তার গাড়ীটা না কি খারাপ হয়ে গেছে।

তখনই ভ্রাম্যমান পুলিশের গাড়ী ছুটল।

ম্যারকুইন ট্রাকে করে পালাচ্ছিল। পুলিশকে দেখে ও গুলি করল। কিন্তু পুলিশ ওকে ধরে ফেলল।

সব কটা ষ্টেটেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে, দুর্ধর্ষ খুনী রজার ম্যারকুইন ধরা পড়েছে।

খবর পৌঁছল টনি কিমারের কাছেও।

এক সকালে টনি ইণ্ডিয়ানা ষ্টেটের হ্যাসণ্ড শহরের থানায় হাজির হয়ে বলল—আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে তাই আমি ধরা দিতে এসেছি।

কি নাম তোমার ?

টনি কিমার।

কেনেটসভাইল শহরে রজারের বিচার শুরু হল।

টনি কিমার হল রাজসাক্ষী।

রজার ম্যারকুইনের মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল বিচারে।

[ছয়]

আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণে পাহাড়ের ধারে জেসমীন লজ ওখান থেকে একটা নদী এবং একটা শহরের অংশ দেখা যায়। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দটা এই বাড়ির মেয়েদের পক্ষে খুব ভালসময় ছিল, ইথেল ও এ্যালসি এরা নানান আনন্দের উপকরণ নিয়ে সময় কাটাত। শীতের সন্ধ্যের সময় তারা গাড়ী করে বেরোত। গাড়ীর মধ্যে গীটার বাজত।

তাদের একজন শিল্পী ছিল, নাম মিসেস ভার্লিডি গ্রে ট্রেভর। বিধবা হবার পর তিনি এখানে ফিরে এসেছিলেন। পেছনের একটা ঘরে থাকেন তিনি। ওর স্বামী ক্যাভালরি রেজিমেণ্টে ছিলেন, ভারতবর্ষে যুদ্ধে মারা যান। তিনি দুজন মেয়ে ছাড়া পিসীর জন্যে কিছু রেখে যাননি, মিসেস ভার্লি ভারতবর্ষ থেকে কয়েক বাক্স কাপড় চোপড় নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। ইথেল ও এ্যালসির জন্মের আগেই এসব ঘটেছিল, মিসেস ভার্লিডি গ্রে বড় একটা বেরোতেন না, তিনি তাঁর উপরের ঘরে বেশির ভাগ সময় কাটাতেন, যখন মেয়েরা বাড়িতে পার্টি ডাকত তখন পিসী ঘরে তালাবন্ধ করে থাকতেন।

এই দুটি মেয়েকে সবাই বুদ্ধিমান ভাবত। তারা নাটক করত, খেলাধূলা করত এবং দুজনে মিলে গান করত। তাদের মাথার তুলনায় হাত পিছিয়ে ছিল না, তারা ভাল হাতের কাজ জানত, সুন্দর সুন্দর পোষাক তৈরি করত। মোটের উপর কোন ক্ষেত্রেই কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের ছাড়িয়ে যেতে পারত না। কোনকিছুই তারা ফেলে দিত না, পরিত্যক্ত অব্যবহৃত জিনিসপত্র দিয়ে নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস তৈরি করত।

তাদের যা অভাব ছিল তা হল সন্ধ্যের সময় পরার জন্য দস্তানা। দুজনের দুজোড়া দস্তানা ছিল, ওগুলো তারা কিনতে বাধ্য হয়েছিল। মিসেস ভার্লিডি গ্রের সম্পত্তির মধ্যে কোন দস্তানা ছিল না, উনি কি ভারত থেকে আসার সময় তাড়াতাড়িতে ওগুলো ফেলে এসেছেন? অথবা সেগুলো কি এই ট্রাঙ্কটাতে আছে? একমাত্র এই ট্রাঙ্কটা তারা খুলতে পারেনি সমস্ত চেষ্টা করা সত্ত্বেও, তারা ভাবল ঐ পুরোন সিল্কের ব্যাগটাতে মিসেস ভার্লিডি চাবিটা লুকিয়ে রেখেছেন। ব্যাগটা তিনি সবসময় নজরে রাখেন, তাদের নিজেদের দস্তানাগুলো পুরোন এবং জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

ওরা ছিল লম্বা এবং সুন্দর। ঐ সময়ে সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে খুব সহজে হয়ে যেত। তাদের দেহের যৌবন বৃষ্টির নদীর মত কূলে কূলে ভরে উঠেছিল। তাদের কপালের চুলগুলো সুন্দর বলয়ের সৃষ্টি করেছিল। ইথেল ওদের দুজনের মধ্যে একটু বেশি ভাল দেখতে ছিল। তবে তাদের দুজনেরই চরিত্র বেশ ভাল ছিল।

ওরা কখন আর কাকে বিয়ে করবে সেই ছিল একটা আলোচনার বিষয়। ওখানকার সৈন্য বাহিনীর লোকেদের রাতের স্বপ্নে এই দুজন বোন অনেক দিন ধরেই ছিল। মুসকিল হচ্ছে বোন দুজন সবসময় নানা লোকেদের দ্বারা পরিবৃত থাকত। কেউ তাদের ভালবাসার কথা জানাবার সুযোগ পেত না। ওরা যেহেতু অনেক দিন ধরে অবিবাহিত আছে তাই কেউ সাহস করে এগিয়ে আসত না। দুজন

বোনও ঠিক করেছিল যে ওরা নিজেরাই পছন্দ মত বিয়ে করবে সময় এলে। যেখানেই কিছু তরুণ জড়ো হতো সেখানেই ইথেল আর এ্যালসির নাম শোনা যেত।

এক বসন্তের শেষে ইথেল তার সিদ্ধান্ত নিল। লর্ড ফ্রেড এসেছিলেন মাছ ধরতে। তিনি একটা প্রাসাদে ছিলেন। জেসমীন লজ নদী পথে কয়েক মাইল দূরে। একটা মিলিটারী বল নাচের সময় তাঁকে প্রথম দেখা গেল। তাঁর শহরের স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য ইথেলের হৃদয়ে আঘাত করল। ইথেল ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে গেল, লর্ড ফ্রেডও সুন্দরী ইথেলের ভালবাসার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন, লর্ড ফ্রেডকে মাঝে মাঝেই দেখা যেতে লাগল ইথেলের সাথে নাচতে। পরের দিন একটা পিকনিক পার্টিতেও ফ্রেড ও ইথেলকে দেখা গেল। তার আগের পুরো সন্ধ্যেটাই ইথেল কাটিয়েছে কাপড় পছন্দ করতে। সে ভারতবর্ষ থেকে আসা মিসেস ভার্লিডি গ্রের মসলীন কাপড়গুলো পরে পরে দেখল কোনটাতে তাকে বেশি সুন্দর দেখায়। কিন্তু মসলীন কাপড় কাজে দিল না, কারণ আকাশে যখন চাঁদ উঠল তখন বৃষ্টি নামল। ইথেল শীতে কাঁপতে লাগল। লর্ড ফ্রেড তাঁর ব্লেজার দিয়ে ইথেলকে জড়িয়ে দিলেন।

পরের দিন আরও বৃষ্টি হল এবং সবকিছু নষ্ট হয়ে গেল। জেসমীন লজের বাগান থেকে প্রত্যাশিত চেয়ারটাকে ঘরে এনে রাখতে হল, ঘরের মধ্যে ফুলদানীতে ফুলগুলো অপেক্ষা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। মেড চলে গেছিল, এ্যালসি তার ঘরে আরাম করে একটা বই পড়ছিল সুতরাং পিসীর কাছে চা নিয়ে যাওয়ার ভার ছিল ইথেলের। সে তাই পিসীর পেছনের ঘরটাতে ঢুকল চা নিয়ে। আকাশ মেঘে ঢেকে থাকায় চারদিক বেশ অন্ধকার, ইথেল যখন আস্তে আস্তে ফোটোগ্রাফটা রেখে দিচ্ছিল তখন তার মন একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তার ঠোঁট চেপে বসল, তার ভুরুজোড়া কাছাকাছি হল। এক পা এক পা করে আস্তে আস্তে সে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। তার

গলার স্বর পাল্টে গেছিল, সে বলল পিসী তুমি বলেছিলে আমাকে দু'একটা কথা বলবে···?

সময় গড়াতে লাগল, লর্ড ফ্রেড যদিও কথা দিচ্ছিলেন তবু ঠিক ইথেলের বাঁধনে ধরা দিচ্ছিলেন না। ইথেল মনে মনে নানান চিন্তা করতে লাগল, তার কি পোযাক-আশাক ভালো হচ্ছে না অথবা তার গায়ের রংটা ঠিক আকর্ষণীয় নয়? নাচের সময় লর্ড ফ্রেডকে আর বিশেষ পাওয়া যেত না, যদিও তিনি ইথেলের সাথে নাচতেন তাহলেও একটা দূরত্ব বজায় রাখতেন, এবং তার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন। ইথেল ভাবত লর্ড ফ্রেড কেন তার আলিঙ্গনে টেনে নিলেন না, লর্ড ফ্রেড তার সাথে কথাবার্তাও কমিয়ে দিচ্ছিলেন, এদিকে তার লণ্ডনে ফিরে যাবার সময় এসে যাচ্ছিল। ইথেল মনে মনে অস্থির হয়ে পড়ছিল। এ্যালসি তাকে একদিন বলল তুমি কি ভেবেছ ওকে কোনদিন পাবে?

সে তার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করল তবুও কোথায় যেন ঘাটতি থেকে যাচ্ছে।

এরপরেই সে তার পিসীর সাথে মাঝে মাঝেই দেখা করতে লাগল।

পিসীর সেই পেছনের ঘরে ইথেল আত্মসমর্পণ করল। দরজা বন্ধ করে পিসীর সাথে অনেক সময় ধরে শলাপরামর্শ চলতে লাগল। এ্যালসি দরজার বাইরে থেকে হাসি ও টুকরো টুকরো কথা শুনতে পেত, কিছুই বুঝতে পারত না।

একদিন ইথেলকে সামনে পেয়ে এ্যালসি বলল, তুমি কি পিসীকে মেরে ফেলতে চাও, পিসীর শরীর খারাপ, সারাদিন কি এত কথাবার্তা চলে তোমাদের মধ্যে, হঠাৎ তোমার এই পিসীপ্রীতির কারণ কি?

ইথেল কোন উত্তর দিল না।

এদিকে পিসী অস্থির হয়ে একদিন বলে ফেললেন, 'ওঃ তোমার জ্বালায় আর তো পারি না, কি করে একজন পুরুষকে বশ মানাতে হয় আমি তোমায় কি ভাবে শিখিয়ে দেব? আমি তোমায় কয়েকটা

সুন্দর জিনিস দিতে পারি তাতে যদি তোমার কিছু হয়। ঐ ট্রাঙ্কগুলো নামাও তো।'

'ওহ আন্টি ওগুলোকে আমি কি করে নামাব? ওগুলো ভীষণ ভারী।'

'ভারী, ওগুলোকে যখন এখানে নিয়ে আসা হয় তখন ভারী ছিল, এখন আর ওগুলোর মধ্যে কিছু নেই। ইঁদুর কেটে সব শেষ করে দিয়েছে।'

'না না, ইঁদুরে কাটেনি।'

'তাহলে আমাকেই দেখতে হচ্ছে' তিনি শালটা খুলে ফেলে দিয়ে উঠে বসলেন। দরজার দিকে টলতে টলতে যেতে যেতে বললেন, 'আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ইঁদুর কতদূর সর্বনাশ করেছে।'

'কিন্তু পিসী তুমি অসুস্থ' ইথেল বলল।

পিসী টলতে লাগলেন, ইথেল ওকে ধরে ফেলে আবার বিছানায় নিয়ে এল। কিন্তু সেদিনের কথাটা তার মনে সবসময় ঘুরছিল। এটাই শেষ সুযোগ, লর্ড ফ্রেড কাল লণ্ডনে ফিরে যাচ্ছেন। আজ সন্ধ্যের বল নাচের সময় কিছু করতে না পারলে আর কোনদিন কিছু হবে না। আজ সন্ধ্যের সময় যে কোনমতে তাকে সবচেয়ে সুন্দরী হয়ে উঠতে হবে। পিসীকে শুইয়ে দিয়ে শাল গায়ে দিয়েছিল, তারপর নিজের ঘরে চলে গেল।

ইথেল তার ঘরে দস্তানার খোলা ড্রয়ারের সামনে দাঁড়িয়েছিল, টেনিস পার্টি থেকে ফিরে এ্যালসি তার ঘরে ঢুকল। ঘরে বেনজীনের গন্ধ ছাড়ছিল, এ্যালসি বলল, আজ আমি একটা কথা শুনলাম।'

'কি কথা? ইথেল জিজ্ঞেস করল।

'মিঃ ফ্রেড ভদ্রলোক বেনজীনের গন্ধ সহ্য করতে পারেন না। যেখানে বেনজীনের গন্ধ সেখানে তিনি থাকতে পারেন না।' এই বলে সে চলে গেল।

ইথেলের মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল।

কয়েক মিনিট পরে এ্যালসি আবার ফিরে এসে বলল, পিসীকে তুমি কি অবস্থায় রেখে এসেছিলে ? পিসী ঝিমোচ্ছে।'

তার হাতের মুঠোর ভেতর থেকে একটা ধাতব আওয়াজ ইথেল শুনতে পেল।

ইথেল জিজ্ঞেস করল 'তোমার হাতে কি ?'

'কয়েকটা চাবি পিসীর বিছানার তলা থেকে পেলাম।'

ইথেল হাত বাড়িয়ে চাবিগুলো নিল, তখনই মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ঐ ট্রাঙ্কটা খুলতে হবে যেটা কোনদিন খোলা হয়নি। নতুন দস্তানা পেতেই হবে, যাতে বেনজীনের গন্ধ নেই।

আস্তে আস্তে সে উপরে উঠে গেল, তালাবন্ধ ঘরটার তালা খুলে ঢুকতেই সে চমকে চেঁচিয়ে উঠল। একটা পুরোন টুপির ভেতর থেকে একটা বড় ইঁদুর তার দিকে লাফ দিয়েছিল।

সে রহস্যময় ট্রাঙ্কটার দিকে এগোল, ট্রাঙ্কের উপরে সাদা রঙে লেখা ই-ভি ডি, জি, লেখাটা যেন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ঘরের এই কোণটাতে কোন আলো ছিল না তাই অন্ধকারে সাদা রঙটা জ্বল জ্বল করছিল। ইথেলের মনে হচ্ছিল দুটো ঠাণ্ডা অপার্থিব চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, ইথেলের ভেতরে হৃদযন্ত্রটা প্রচণ্ড শব্দে কাজ করে চলছিল। ইথেল তার নিজের হৃদযন্ত্রের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল, ইথেল পেছনের দিকে একবার তাকাল, না কেউ কোথাও নেই। সে মনে মনে ভাবল ভয় পেলে চলবে না, যেখানে লর্ড ফ্রেডকে খুশী করার প্রশ্ন সেখানে ভয় পেলে চলবে না।

ট্রাঙ্কটার দুদিকে দুটো পেতলের তালা লাগানো ছিল। ইথেলের হাত সামান্য কাঁপছিল তবুও সে একদিকের একটা তালা খুলে ফেলল। ভেতরে কি আছে দেখার অধৈর্য্য আগ্রহে সে একদিকের ডালাটা সামান্য উঁচু করে হাত ঢুকিয়ে দিল। তার হাতে প্রথমে যেটা উঠে এল সেটা মনে হল সুন্দর একটা ওড়নার একদিক, আনন্দে ইথেল সবকিছু ভুলে গেল। সে সেটা ধরে টান দিল কিন্তু মনে হল ভেতরে কোথাও আটকে

আছে। ইথেল ওটা ছেড়ে দিল, তার চোখের ভুলই হোক আর যাই হোক কাপড়টা ছেড়ে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে ট্রাঙ্কের মধ্যে ঢুকে যেতে লাগল, আর একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার ইথেল লক্ষ্য করল একটা বাচ্চাদের শাদা দস্তানার আঙুলের সামনের অংশটা মুহূর্তের জন্য বেরিয়ে এসে আবার ঢুকে গেল।

ইথেলের হৃদযন্ত্র যেন বন্ধ হবার উপক্রম হল। সে দেখতে লাগল ট্রাঙ্কের ডালাটা উপরে উঠে যাওয়ার জন্য কাঁপতে লাগল, ইথেল দ্বিতীয় তালাটার চাবি কাঁপা কাঁপা হাতে নিয়ে বসেছিল কিন্তু সে দেখল দ্বিতীয় তালাটা নিজে থেকেই খুলে গেল।

ডালাটা খুলে যেতেই সে পিছোতে শুরু করল, সে দেখতে পেল বাক্সের মধ্যে থরে থরে সাজানো দস্তানা, ভাবল 'লর্ড ফ্রেড এবার তুমি আমার হাতের মুঠোয় আসতে বাধ্য।'

এটাই তার শেষ চিন্তা। ইথেল আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে পাগলের মত দস্তানাগুলোর মধ্যে হাত ডুবিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা সাদা দস্তানা বিদ্যুৎ চমকের মত ইথেলের চুল ধরে ফেলল। চুল ধরে তার মাথাটা নামিয়ে আনল প্রচণ্ড শক্তিতে। তারপরে আবার ইথেলকে পেছনে ঠেলে দিয়ে তার গলার উপর লাফিয়ে পড়ল।

ইথেলের ছটফটানিতে দস্তানার একটা অংশ ছিড়ে গেল কিন্তু তার বজ্রমুষ্টি ইথেলের গলা ছাড়ল না।

দস্তানাটা কিন্তু ইথেলের হাতের মাপের থেকে অনেক ছোট।

ইথেলের ভয়ার্ত আর্তনাদে এ্যালসি ছুটে এসে দেখল ইথেলের প্রাণহীন দেহটা মাটিতে পড়ে আছে। সেইদিন ইথেলের পিসীও মারা গেছিলেন, ইথেলের মৃত্যুর আগেই। ওদের একসাথেই কবর দেওয়া হয়েছিল। কবরের ভিতর তুজনে কি কথা বলেছিল কে জানে?

[সাত]

মিঃ হেনরী স্টেপলস্ যখন এপার্টমেন্ট হাউসের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন তখন তার পায়ে একটা নতুন উদ্যম পেলেন। কাল রাতের স্বপ্নটা কি ভাবে তার মনের ওপরে সংক্রমন করেছে।

সে তার সেলসম্যানের নতুন কাজে এখনও ঠিক পরিচিত হয়নি, সে এখনও কাঁচের দেওয়ালের পেছনে বসে থাকা ম্যানেজারের সাথে পরিচিত হয়নি, কিন্তু শনিবারের কাজটা সে প্রসংশনীয়ভাবে করেছে।

তাদের ছোট্ট ঘরটাতে নোরা রেডিওতে গৃহস্থালী সম্বন্ধে শিক্ষার আসর শুনছিল। তার মনে পড়ছিল তার ছেলে চার্লির কথা, বাপ ও ছেলে দুজনে সকালে ব্যায়াম করে। তারপরে চার্লি অনিচ্ছা নিয়ে স্কুলে যায়।

স্টোরে ঢুকেই সে সবার সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

তারপর সে দেখল তার কাউন্টার থেকে সাদা আচ্ছাদন সরিয়ে নেওয়া হল। সে বাইরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকল নটা বাজার অপেক্ষায়।

একজন ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের কাপড় চোপড়ের শোকেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরের কাপড়গুলো দেখছিলেন। নিশ্চয়ই ভদ্রমহিলা কিছু কিনবেন। তার চেহারা ও কথাবার্তার বিশেষত্বের জন্য তাকে মেয়েদের জিনিসপত্র দেখাবার ও বিক্রি করার ভার দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ মিনিট পরেই ভদ্রমহিলা দোকানে ঢুকলেন—পেছনে সঙ্গের ভদ্রলোক ; স্টেপলস্ জানে কিভাবে কাকে বোঝাতে হয়।

সে মনে মনে বলল, 'বিক্রির ক্ষেত্রে ভদ্রতা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।'

তার অভিনন্দনে প্রভাবিত না হয়ে ভদ্রমহিলা তাঁর কথা পাড়লেন।

'বার বছরের ছেলের জন্য একটা নীল স্যুট চাই'।

'নিশ্চয়ই দেব। আমাদের খুব ভাল স্টক। কিসের চাই সার্জ অথবা চেভিয়টের ?'

'আপনি দেখান না সব।'

'তাহলে রঙটাই ব্যাপার, কাপড়টা ব্যাপার নয়। দুটো কাপড়েরই দুরকম গুণ আছে, এখান থেকে কিনলে দুবছর চলে যাবে।'

'আচ্ছা' মহিলা বললেন।

বাক্সগুলো বের করতে করতে স্টেপলসের অস্বস্তি বোধ হল, সে তার ক্রেতার মনে উৎসাহ সৃষ্টি করতে চায়।

সে বলল, 'বার বছর বয়স বললেন, এই বয়সের ছেলেদের মাপ ঠিক করা বেশ মুশকিল। কারুর বড় লাগতে পারে, কারুর একসাইজ ছোট লাগে, আমারও বার বছরের একটা ছেলে আছে।'

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না। এইরকম ক্রেতাকে স্টেপলস্ পছন্দ করে না। যাই হোক সে অন্যভাবে আলাপ জমানোর চেষ্টা করল। 'কত বড় ছেলে ? বয়সের তুলনায় বড় না ছোট ?'

'সাধারণত যা হয়'—মহিলা উত্তর দিলেন।

'বাচ্চাদের নিয়ে এলেই সবচেয়ে সুবিধে হয়।' পরে আবার যোগ করল, 'অবশ্য এই সময়ে ওদের স্কুল থাকে।'

'হ্যাঁ' মহিলার উত্তর।

অদ্ভুত ব্যাপার, স্টেপলস্ ভাবছিল, ভদ্রলোক ভদ্রমহিলাকে কাপড় পছন্দ করতে কোন সাহায্য করছেন না, তিনি দূরে কাউন্টারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, কিছু একটা ভাবছেন, বোধহয় তিনি কোন কলেজের প্রফেসর, এরা একটু অন্যমনস্ক হয়।

স্টেপলস্ বলল, 'আমি বরঞ্চ এগুলো রেখে দিচ্ছি, আপনি বরঞ্চ চারটের সময় ছেলেকে নিয়ে আসবেন, তাতে সুবিধে হবে।'

'না না, আমি কিনে নিয়ে যাব' মহিলা বললেন।

'একটু বড় সাইজ নিন, এই বয়সের ছেলেরা খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।'

'এইটা ভাল মনে হচ্ছে' ভদ্রমহিলা বললেন, 'এই চেভিয়টের স্যুটটা।'

'হ্যাঁ ওটা খুব ভাল' স্টেপলস্ আশ্বাস দিয়ে বলল, 'এটা খাঁটি স্কচ চেভিয়টের তৈরি।' আমি কথা দিচ্ছি এর পুরোটাই উল, এতে কোন কাদা মাটির দাগও পড়বে না, দু' বছর হেসে খেলে কেটে যাবে।'

স্টেপলস্ স্যুটটা তুলে দেখাল যাতে ভদ্রলোকের নজরে পড়ে, কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর চিন্তায় ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা স্যুটটা দেখতে দেখতে একটা পকেটে হাত ঢোকালেন।

স্টেপলস্ হেসে উঠল।

'না না ভাবনা করবেন না, বাচ্চারা পকেটে অনেক কিছু ঢোকায়। সেইজন্য পকেটগুলো ডাবল লাইনিং করা। পকেট ছিড়বে না।'

ভদ্রমহিলা অনেকক্ষণ পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাখলেন। অনেকক্ষণ স্যুট তুলে ধরে থাকতে থাকতে স্টেপলসের বোকা বোকা মনে হচ্ছিল।

'পকেট ভাল, অনেক বড়, দেখতে হবে না' একটু জোরের সাথে বলল যাতে ভদ্রমহিলা পকেট থেকে হাতটা বের করে নেন। 'কিন্তু এই স্যুটের জন্য মাত্র একজোড়া প্যান্ট আছে বেশি নেই...।'

সে কথা থামাল বিস্ময়ে, কারণ ভদ্রলোক দরজার দিকে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পড়লেন তারপর আস্তে আস্তে আবার স্ত্রীর কাছে এগিয়ে এলেন।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমরা এই স্যুটটাই নেব। ছেলেটা সব সময় বড় ট্রাউজার পরতে চায়, কিন্তু বাচ্চাদের ওসব আমার ভাল লাগেনা।'

ভদ্রমহিলা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, স্টেপলস্ নিশ্চিন্ত হল। ওঃ এত কথা বলতে হয় এ কাজে। অন্যেরা যারা বেল্ট বা আণ্ডারওয়্যার বিক্রি করে তাদের এত কথা খরচা করতে হয় না।

'সকল বিক্রেতারা' সে মনে মনে ভাবল, 'এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যেখানে ক্রেতারা কিছু না কিনে থাকতে পারে না।'

সে বলল, 'আপনার ছেলে দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে এসে নতুন স্যুট পেয়ে নিশ্চয়ই খুশী হবে।'

'আমাদের তাড়াতাড়ি আছে' ভদ্রলোকের গলার স্বরে স্টেপলস্ একটু অবাক হল।'

'দিচ্ছি দিচ্ছি।'

সে জানে খদ্দেরের সাথে ঘরের লোকের মত ব্যবহার করতে হয়, সে বলল ঃ

'খদ্দের আর ক্রেতার মধ্যে বিশ্বাস থাকা দরকার, ওহ আপনাদের দামটা বলা হয়নি।'

'কত হয়েছে !' ভদ্রলোক মানিব্যাগ বার করলেন।

স্টেপলস্ মূল্য তালিকা দেখে বলল। 'উনত্রিশ পঞ্চাশ', একটু বেশি দাম, তবে কাপড় নিশ্চয়ই ভাল। যদি ছেলে তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়, তবে চলে আসবেন। আমরা বিনে পয়সায় অল্টার করে দেব। এই যে আমার কার্ড।'

'ধন্যবাদ' ভদ্রমহিলা হাসলেন তার দিকে চেয়ে। ভদ্রমহিলার হাসির মানে বের করতে স্টেপলস্‌কে মাথা ঘামাতে হল।

মহিলা আবার বললেন, 'আপনার ব্যবহার ভাল।'

'ধন্যবাদ' বিক্রির কাজে আমাদের সবার সাথে ভাল ব্যবহার করতে হয়। ভাল ব্যবহারই আমাদের মূলধন। আমরা এর সাথে একটা বেশবল উপহার দিচ্ছি। আমার কার্ডটা নিয়ে ওদিকে দেখান, পেয়ে যাবেন।

'দেরী হয়ে গেল আমাদের'। ভদ্রলোকের গলায় বিরক্তি, তিনি স্ত্রী মার্গারেটের হাত ধরে টান দিলেন।

স্টেপলস্ ভাবল ভদ্রলোক আশ্চর্য্য তো, সে তো নোরার সাথে কোনদিন এরকম ব্যবহার করে না।

ভদ্রমহিলা বোধহয় বেসবলের কথা আবার বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কি যেন ভেবে আর বলল না।

স্টেপলস্ ওদের দেখতে লাগল। ওরা তাড়াতাড়ি দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ স্টেপলসের একটা ভুলের কথা মনে পড়ল, সে তাড়াতাড়ি একটা বই নিয়ে এগিয়ে এল। ওদের কাছাকাছি হয়ে শুনতে পেল ভদ্রলোক খুব রাগী গলায় বলছেন 'আমি তোমায় বলেছিলাম মার্গারেট, তুমি নিজে এটা করতে পারবে না।'

মহিলা বললেন, 'ট্রাউজারটা ভাল, সে তো এইরকমই চায়'।

'মাপ করবেন' স্টেপলস্ বলল, 'আমরা নাম ঠিকানা লিখে রাখি আমাদের পৃষ্ঠপোষকদের'।

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত হলেন, কিন্তু ভদ্রমহিলা হাসলেন, বললেন, 'লিখুন মিঃ এবং মিসেস সেইমার ১০০ ফরেস্ট এভিনিউ'।

ঐদিন সন্ধ্যেবেলায় স্টেপলস্ আরাম করে শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ছিল, আজ তার ভাল দিন গেছে।

চার্লি রেডিওর নব ঘোরাচ্ছিল, নোরা রান্নাঘরে। স্টেপলস্ কাগজ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কখনো কখনো তাদের পৃষ্ঠপোষকদের নামও পেয়ে যায়।

'বাবা ও বাবা আমার একটা বেসবল চাই'। চার্লি বলল।

নোরা রান্নাঘর থেকে বলল, 'আমাদের নতুন রেডিওর দরকার নেই। চার্লি যা চাইছে এনে দাও'।

কিন্তু স্টেপলসের কাগজের একটা জায়গায় আটকে গেছিল, সে পড়ল।

"সেইমার, রবিবার, চার্লস, বার বছর বয়স, মিঃ এবং মিসেস সেইমারের একমাত্র পুত্র ১০০ ফরেস্ট এভিনিউ, মঙ্গলবার দুটোয় অন্ত্যেষ্টি।"

—রান্নাঘর থেকে নোরা এসে কাগজটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'মৃত্যু সংবাদও পড়তে বাদ দাও না, চার্লি কি বলছে শুনতে পাচ্ছো না'!

'হ্যাঁ' স্টেপলস্ বলল।

সে উঠে ছেলের রেডিওটা নিয়ে বসল, রেডিওর নবটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে ভাবল, এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, একজনের সাথে অনেক বছর অন্তরঙ্গ ভাবে কাটালেও তাকে সব কথা বলা যায় না।

'বাবা তুমি কিচ্ছু জান না, তুমি কিছু করতে পারছ না।' চার্লি অভিযোগ করল।

'হ্যা দিচ্ছি বাবা' চিন্তিত ভাবে স্টেপলস্ তার হাতটা কপালে তুলল।

সে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, চারদিকে নিশ্চিত নিরাপত্তা, মোটা গদিওয়ালা কুশনটাতে। রেনবার ফুলের ছাপওয়ালা রবারে এ্যাপ্রনটাতে। নীল স্যুট পরা চার্লির মধ্যে। সেণ্টার টেবিলের উপর তার ব্যবহারিক বিদ্যা শিক্ষার বইটার মধ্যে খোলা হয়ে পড়ে আছে, সবদিকেই নিরাপত্তা।

চার্লি বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপার তুমি এটা ঠিক করে দিতে পারছ না। আমি যা চাই তা পাই না'।

'হ্যা' স্টেপলস্ বলল. 'হ্যাঁ বেশির ভাগ জিনিস খুব অদ্ভুত, খুব অদ্ভুত ঠেকে আমার কাছে'। কথাটা সে কাকে উদ্দেশ্য করে বলল বোঝা গেল না।

[আট]

দুজনে হাত ধরাধরি করে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীট ধরে হাঁটছিল।

গ্রেগ থেমে গিয়ে বলল, 'তুমি যা পছন্দ কর এখানেই পাবে।'

হেলেন মাথা নাড়ল। টুপির চিন্তাটা গ্রেগের, তার নয়।

গ্রেগ দেখিয়ে বলল 'ঐ কালোটা কেমন? এটা তোমার স্যুটের সাথে মানাবে।'

হেলেনের ঠোঁট কাঁপল। গ্রেগ সবসময় সতৃষ্ণ নয়নে দেখে হেলেন কি পরল না পরল, হেলেনের এটা খুবই ভাল লাগে। সে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। যৌবন ফিরে পায়। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা খুব ভাল।'

ওরা দোকানে ঢুকল। একজন সেলসম্যান লোক এগিয়ে এল। হেলেন তাকে কালো টুপিটা দেখাতে বলল।

হেলেন দোকানে আসতে চায়নি। কিন্তু গ্রেগ নাছোড়বান্দা। সে কিছু একটা উপহার দেবেই। সে বলে বিদায়কালীন উপহার।

হেলেন তাকিয়ে দেখল গ্রেগের চোখ থেকে খুশীরভাব ঝরে পড়ছে। অবাক হল সে, ও হাসছে কেন। সে নিজেকে প্রশ্ন করল ও হাসছে কেন ? টুপিটা মাথায় পরার জন্য। হেলেন সবসময় গর্ব করে যে সে আধুনিকা।

তার মন এবার দোকানের আয়নার দিকে গেল, সে আয়নায় নিজেকে দেখতে লাগল। কোন নতুন জিনিস পরার পর লোকে যেমন আয়না দেখে সেভাবে নয়। নিজেকে বিয়ের কনে হিসেবে কেমন মানাবে তাই দেখছিল। গ্রেগের পাশে তাকে কেমন মানাবে, লোকে বলে ওকে কনে রূপে ভাল মানাবে। সে ভেবেও দেখেনি। সে এখন শুধু সুখের স্বপ্নিল সাগরে ভাসছে।

পাঁচ মিনিট পরে তারা রাস্তায় বেরিয়ে এল। আবার রোদের মধ্যে তারা দাঁড়াল। গ্রেগ তার ঘড়ি দেখে বলল, 'চল চা খাওয়া যাক।'

'আমি একটা জায়গা জানি। তোমার জায়গাটা বেশ পছন্দ হবে' —গ্রেগের চোখে একটা চাপা উত্তেজনা, হেলেন বুঝতে পারল না কারণটা।

গ্রেগ যেখানে নিয়ে এল সেটা একটা সাধারণ কাফে। দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সে হেলান দিয়ে বসল।

গ্রেগ কথা বলল না, কিন্তু একটা হাত এগিয়ে এসে হেলেনের হাতটা ধরল।

'নানা এখন নয়, ও যতদিন আছে ততদিন নয়'—হেলেন বাধা দিল।

চা খাওয়ার পর গ্রেগ বলল, 'তুমি তাহলে ঐ বাড়িতে একা থাকবে? আমার ভাল লাগছে না ব্যাপারটা—।'

হেলেন মাথা নাড়ল 'আমার অসুবিধে হবে না' সে গ্রেগকে কষ্ট দিতে চায় না। সে তাকে অনেক সুখ দিয়েছে।

ওকে সন্তুষ্ট মনে হল না। সে বলল, 'আর একটা ব্যাপার, এতদিন তোমায় বলিনি। কারণ তুমি একটু অবুঝ। ব্যাপারটা হচ্ছে টাকার, আমি ব্যাঙ্কের সাথে বন্দোবস্ত করেছি—।'

হেলেনের গাল লাল হয়ে উঠল। কোন মেকী গর্বে নয়, কারণ তোমার কেউ না থাকলে গর্ব করতে পারে না। 'ওঃ গ্রেগ তা হতে পারে না।'

গ্রেগ রাগত স্বরে বলল, 'কেন হবে না। সাণ্ড্রা রাজী হয়েছে।'

সাণ্ড্রা···ওহ কত সহজে এবং পরিচিত ভাবে সে নামটা উচ্চারণ করল। আর ঐ মেয়েটার সাথে ওর দু' মাসও আলাপ হয়নি।

লণ্ডনে আলাপ হয়েছিল। লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পর ও বুঝতে পেরেছিল, ও সেই আর আগের মত নেই। এরপর সে একটা ভাল কাজ নিয়ে লণ্ডনে চলে গেল, প্রায় একমাস সে তাকে দেখেনি।

সাণ্ড্রা···মেয়েটা বিজ্ঞাপনের প্রতিষ্ঠানে কাজ করে। মেয়েটা বুদ্ধিমান। মেয়েটা কি সত্যিই সুন্দর? সে কি হেলেনের মত ওকে সুখী করতে পারবে?

সাণ্ড্রা···হেলেন ভাবতে লাগল মেয়েটা কি রকম? কাফেতে একটা মেয়ে ঢুকল। হেলেন ভাবল এই রকম কি দেখতে মেয়েটা? মেয়েটা চারদিকে কি যেন খুঁজছিল।

তারপর মেয়েটা এদিকে ঘুরল। মেয়েটা খুব সুন্দর, একটা লাজুক নমনীয়তা আছে মেয়েটার। হেলেন মেয়েটাকে অন্যমনস্ক ভাবে দেখে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার চোখটা বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল।

মেয়েটা তাড়াতাড়ি এদিকে এগিয়ে এল, 'তাহলে তুমি পারলে, ডার্লিং।' হেলেন গ্রেগের গলা দূর থেকে শুনতে পেল। মেয়েটার

মুখ খুশীতে ঝলমল করছিল। 'এই হচ্ছে সাণ্ড্রা কালকের সুখী কনে,' গ্রেগের গলার আওয়াজ আরও দূর থেকে ভেসে এল।

[নয়]

দিনের শেষে সে ভাবছিল—এত অবারিত মাঠ এত আলো ; এত স্নিগ্ধ বাতাস সে আর কোনদিন পায়নি। যে নদীর কুল কুল শব্দ নিজের রক্ত ও হাড়ের মধ্যে শুনতে পাচ্ছিল। তার মনের মধ্যে চিন্তা ও মূর্তিগুলো জলে মাছ যেমন সহজে সাঁতার কাটে তেমনি ভেসে যাচ্ছিল।

সে বাড়ির দিকে ফিরল। তার বাড়ির পেছনে চার্চের চূড়া যেন মেঘের সাথে খেলা করছে। চার্চের চারদিকে সবুজ নরম ঘাসের গালিচা পাতা। যেন কত সুখ সেই ঘাসের জগতে নিশ্চুপ অচঞ্চল হয়ে আছে। ধারে ধারে বড় বড় গাছ ঘাসের উপর ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ ছায়ার জগতে যেন কত অজানা রহস্য লুকোচুরি খেলছে।

আবেগ অনুভূতির ধবল ধারায় স্নান করতে করতে জাফা কডলিং তার নিজের বাড়ির বেড়ার কপাট খুলে নিজের বাগানে এসে দাঁড়াল, মালী কাজ করছিল। বাড়ির অন্যদিকের লনে বাচ্চারা খেলছিল। সে তাদের হাসি কথাবার্তা শুনতে পেল। সে প্রচণ্ড সুখ পাচ্ছিল। তার বাড়িটাও খুব সুন্দর। অনেক জানালা দিয়ে বাড়িটা বাইরের প্রকৃতিকে ভেতরে আহ্বান জানিয়েছে। একপাশে একটা ওয়াল নাট গাছ বাড়িটার পাশে বন্ধুর মত দাঁড়িয়ে আছে। গেটের কাছে লতানো ফুলের গাছ আলোর আশায় উপরে উঠে গেছে। বাড়ি ঢোকার সময় শুকনো পাতাগুলো পায়ের তলায় মচ মচ শব্দ করে। সে একটা ফরাসী জানালা দিয়ে খাওয়ার ঘরে ঢুকল।

ভেতরে কেউ ছিল না, তিনি একা বোধ করতে লাগলেন। একমাত্র ঘড়িটা ঐ নির্জন ঘরে টিক্‌টিক্ করে চলছিলো। যাক এবার তিনি উপরে গিয়ে তার নতুন বইয়ের ঘটনা ও দৃশ্যগুলো যা ভেবে রেখেছেন, সে সব লিখে ফেলবেন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় গুনগুন করতে করতে একজন মেড তার গা ঘেঁষে নেমে গেল। তিনি নিজের ঘরের দিকে এগোলেন। ঘরের দরজা সামান্য খোলা ছিল। তিনি ভেতর থেকে গলার স্বর পেলেন। তিনি দরজায় হাত দিলেন কিন্তু দরজা খুলল না, তিনি ঠেললেন কাজ হোল না দেখে আরও জোরে ঠেললেন, তাতেও হোল না, দরজার ওপাশে কিছু দেওয়া আছে নাকি ? সে কাঁধ ঠেকিয়ে দরজাটা ঠেলতে লাগল। হঠাৎ বিদ্যুত চমকের মত তার মনে উদয় হল তার স্ত্রী ভেতরে আছে। নিশ্চয়ই কোন পুরুষের সাথে, তিনি খুব নরম গলার স্বর শুনেছেন। এরকম লোকে ভালবাসার ছলের সাথে কথা বলে। তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, মনের মধ্যে কথাগুলো আগুনের পিণ্ডের মত জ্বালা দিতে লাগলেন। তিনি আবার পাগলের মত দরজা ঠেললেন। একটুও খুলল না। এবার তিনি দরজায় শব্দ করে 'মিল্ড্রেড মিল্ড্রেড' বলে চেঁচাতে লাগলেন। কোন উত্তর এল না। তিনি এবার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন, তিনি একটা আয়না দেখতে পেলেন। আয়নাতেই তিনি অকল্পনীয় অসহ্য দৃশ্যটা দেখলেন। চেয়ারে একজন পুরুষ বসে আছে। চেয়ারের হাতলের উপর বসে মিল্ড্রেড লোকটার ঠোঁটে ঠোঁট রেখে গভীর আবেগে আপ্লুত হয়ে গেছে। তিনি পাগলের মত আবার দরজা টানলেন। স্ত্রীর নাম ধরে চেঁচাতে লাগলেন। কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

তিনি আবার দরজার ফাঁকে চোখ রাখলেন। ঘরটা নিস্তব্ধ, ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজ একটা আতঙ্কিত পরিহাসের মত মনে হচ্ছে। তার বুকে দড়াম দড়াম করে শব্দ হচ্ছিল। ওদের ওঁর বুকের শব্দটা শুনতে পাওয়া উচিত।

হঠাৎ তিনি ভাবতে আরম্ভ করলেন ওদের মনোভাব ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা, তিনি ইচ্ছে করলে এদের দুজনকে শেষ করে দিতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। কেন করবেন ? তিনি লেখক —অন্যের আবেগ অনুভূতিতে তিনি অনেক সময় আক্রান্ত হন। কিন্তু এখন নিজের স্ত্রীর ব্যাপারে তিনি প্রতিক্রিয়াহীন, আবেগহীন হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছেন।

তিনি শুনতে পেলেন মেড উপরে উঠে আসছে সিঁড়ি দিয়ে, একটা দৃশ্যের সৃষ্টি হবে তিনি পাশের ঘরের দিকে চলে গেলেন। ঘরটা তালা বন্ধ ছিল, তার পাশের ঘরটা দরজা বন্ধ। ইতিমধ্যে মেড এসে গিয়েছিল। তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন 'ওহ মেরী'। তাঁকে বিমূঢ় করে দিয়ে মেড তাকে দেখতে পায়নি ভাব করে যার স্টাডির ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

তিনি মেডের উদ্দেশ্যে একটা গালাগাল দিয়ে একটা চেয়ার নিয়ে এলেন, দরজায় ধাক্কা দিয়ে খোলার জন্য। না তার মনে রাগ ছিল না, তার স্ত্রীর প্রতিও না গিলবার্টের উপরও না।

দরজা খুলে মেরী হাসিমুখে বেরিয়ে এল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন মেরী দরজাটা খুলে রেখে যাও। মেরী সাবধানে দরজাটা বন্ধ করে দিল, তিনি গালাগাল দিতে দিতে মেরীর দিকে দৌড়ে গেলেন। একসাথে তিনটে করে সিঁড়ি নামতে লাগলেন কিন্তু মেরী অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় তার নাগাল এড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকে তার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল।

কডলিং মনে মনে ভাবতে লাগলেন আজকে দরজার হাতলগুলোতে কিছু একটা হয়েছে। তিনি চুপি চুপি বললেন একটা লোহার রড বা কাঠের দণ্ড দরকার। তিনি বাগানের দিকে দৌড়ে গেলেন তখনই আশ্চর্যজনক ঘটনাটা ঘটল। তিনি একেবারে বাগানের মালীর গায়ের উপর গিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যজনকভাবে মালীর সাথে তার ধাক্কা লাগল না। তিনি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন, আরও অবাক হয়ে দেখলেন বণ্ড তার পাশ দিয়ে চলে গেল কিন্তু তাঁকে দেখতে পাওয়ার

কোন লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। কডলিং ভাবতে লাগলেন তিনি কি ভূত হয়ে গেছেন? তাঁর নিশ্বাস আটকে আসতে লাগল। কিন্তু তারপরেই কডলিংয়ের বেশ মজা লাগল। তিনি দৌড়ে গিয়ে আবার মালীর শরীরের ভেতর দিয়ে চলে গেলেন। তিনি মালীর চারদিকে অনেকবার ঘুরে বেড়ালেন কিন্তু মালীর মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। তিনি এবার তার অবস্থার কথা ভাবতে লাগলেন, তাঁর কোন অবস্থার পরিবর্তন হয়নি, শুধু কোন কারণে অন্যলোকে তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না। অন্যদিকে তাঁর সমস্ত অনুভূতি সমস্ত ইন্দ্রিয় বজায় আছে। তিনি বোধহয় কোনমতে অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তবে কি তিনি মারা গেছেন? না, মৃত্যুর চেহারা এরকম হয় না, তিনি কি করে সব অনুভূতি সম্পন্ন আছেন। তাছাড়া মৃত্যু কখনো এমন মজার ব্যাপার হতে পারে না।

সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অনেক কথা ভাবতে লাগলেন। এমন কোন অদৃশ্য মানুষের কথা কোথাও পড়েছেন বা শুনেছেন মনে করতে লাগলেন। বগু গজ কুড়ি দূরে তার কাজে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় বাড়ির অন্যদিক থেকে তার ছেলে মেয়েরা এদিকে এল, ছোটটি সবার আগে আগে ছিল, তার হাতে একটা ছোরা। ছোরাটা স্টীলের তৈরি নয়। ছোরাটা আরও উজ্জ্বল কোন পদার্থ দিয়ে তৈরি। সোনার ছোরা নাকি আগুনের ছোরা। বড় ছেলে গেব্রিয়েল ছোরাটা বগুর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো ছোরাটা ভাল হয়েছে? বগু ছোরাটা নিয়ে স্মিতমুখে পরীক্ষা করতে লাগল, কিন্তু ছোরাটা ধরার সাথে সাথে বগুর হাতটা স্বচ্ছ হয়ে গেল, তার হাতের রক্তবাহী শিরাগুলো দেখা যাচ্ছিল। কডলিং অবাক হয়ে দেখছিলেন তাই মালীর উত্তর শুনতে পান নি। ছেলেরা আবার জিজ্ঞেস করল। 'ছোরাটা কেমন হয়েছে'; কডলিং গিয়ে ছোরাটা দেখতে লাগলেন তার সুন্দর তিনজন ছেলে মেয়ের সামনে। বগু উত্তর দিল, ছোরাটা ভাল হয়েছে না খারাপ হয়েছে কি বলব? ছোরা কিন্তু কোন ভাল কাজে

লাগেনা, বগু গেব্রিয়েলের হাতে ছোরাটা ফিরিয়ে দিল, কিন্তু ছোট বাচ্চাটি সন্তুষ্ট নয়, সে আবার জিজ্ঞেস করল ছোরাটা ভাল হয়নি। বগু বলল হ্যাঁ ভাল হয়েছে, বেশ ছোটখাটো হয়েছে, এই বলে বগু তার কাজে চলে গেল। কিন্তু ছেলে মেয়েরা তাতেও সন্তুষ্ট হল না, তারা বগুের পেছন পেছন যেতে লাগল। আবার জিজ্ঞেস করল ছোরাটা ভাল হয় নি? বগু আবার ছোরাটা নিয়ে দক্ষ সৈনিকের মত বাতাসে কয়েকপাক ঘুরিয়ে নিল। তারপর বাচ্চা মেয়েটার একগাছি চুল তুলে ধরে ছোরাটা দিয়ে কেটে ফেলল, চুলটুকু উপরের দিকে তুলে ধরে দেখল কিছুক্ষণ তারপর বলল, 'ছোরাটা স্টীলের হলে ভালো হত'। ছোরাটা ফিরিয়ে দিয়ে সে আবার কোদাল তুলে নিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু গেব্রিয়েল রাগের স্বরে বলল, তুমি শুধু ছোরাটা ভাল হয়েছে কি খারাপ হয়েছে বল, হ্যাঁ কি না বল। বগু উত্তর দিল 'না'। গেব্রিয়েল ছোরাটা ফেরৎ নিয়ে ওদের সাথে বাগানের অন্যদিকে চলে গেল।

কডলিং মাটি থেকে চুলের গোছাটা তুলে নিয়ে দেখল, চুলগুলো খুব সুন্দর। কডলিংয়ের রাগ হল। সে মাটি থেকে একটা ছোট টব তুলে নিয়ে বগুের দিকে ছুঁড়ে মারল। আশ্চর্য্যজনকভাবে টবটা বগুের শরীরের মধ্যে দিয়ে চলে গেল এবং তার কোদালে লেগে ভেঙে গেল। কিন্তু বগুের নজরে পড়ল না, কডলিং আরও রেগে গিয়ে বগুের কাঁধের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু বগু তার প্রভুকে পিঠে একখানা পাতলা কাপড়ের মত ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। কডলিং এবার কিছুটা বিরক্ত হল। কি ব্যাপার ঘটে গেল এর মধ্যে যে সবকিছু পালটে গেল, কডলিং ঘড়ি দেখল, ছটা বাজে, ঘড়ির টিকটিক শব্দ সে এখনও শুনতে পাচ্ছে। আচ্ছা তার স্ত্রীর সাথে উপরের ঘরে কে আছে। কডলিং বাড়ি ঢোকার জন্য জানালার দিকে এগোলেন, কিন্তু জানালা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, তিনি আবার বগুের দিকে

দেখতে লাগলেন। এখনও বাগানে ঘুর ঘুর করছে।

তিনি আবার বণ্ডের দিকে চলতে লাগলেন, সেই সময় তার ছেলে-মেয়েরা উত্তেজিত ভাবে এসে উপস্থিত হল, তারা বণ্ডকে একটা বাক্স দিয়ে বলল।

'বাক্সটা সুন্দর না' ?

বাক্সটা দেখে বণ্ডের মুখ উজ্জ্বল হল। সে বসে পড়ে বাক্সটা দেখতে লাগল, বাক্সের ছোট্ট ডালাটা খুলে ফেলতেই একটা সাদাপাখী উড়ে গেল, বণ্ড বলল, 'পাখীটা মাছরাঙা' ?

গেব্রিয়েল বলল, 'হ্যাঁ মাছরাঙা এই ওখানে উড়ছে'। "যাঃ পাখীটা পালিয়ে গেল এখন আমরা কি করব ?'

উত্তরে বণ্ড বাক্সটা ফেরৎ দিয়ে অন্যদিকে চলে গেল। ছেলেমেয়েরা ঝর্ণার দিকে যেতে লাগল, কডলিং ওদের পিছনে পিছনে গেলেন। ওরা বাক্সের ডালাটা বন্ধ করতে পারছিলনা, কডলিং চেষ্টা করলেন তাদের সাহায্য করতে, কিন্তু অসহায়। তারা সবাই জলের ধারে গিয়ে বাক্সটা পেতে ধরল একটা আগুনের তৈরি কাৎলা মাছ বাক্সে ঢুকে আবার লাফিয়ে বেরিয়ে গেল। মাছটা জলে ডুবে যাওয়ার পর বুদবুদ উঠল, গেব্রিয়েল নেচে উঠে আনন্দে বলল,

'ওখানে, এভি' ! 'কি' ইভ বলল 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা,'

'আমিও দেখতে পাচ্ছি না' এডাম বলল।

'তোমরা সুন্দর মাছটা দেখতে পাচ্ছো না' ?

'না' এডাম বলল।

'বুদ্ধু সব' ঐ তো জলের মধ্যে চলে গেল।

'একটা বঁড়শি হলে ভাল হত' এডাম বলল।

'না না না' গেব্রিয়েল বাক্সটার ডালা বন্ধ করে বলল।

জাফা কডলিং জলের ধারে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর যখন চোখ তুলে তাকালেন তখন ছেলে মেয়েরা চলে গিয়েছিল। তিনি বাড়ির দিকে ফিরলেন, কিন্তু বাড়ির সব জানালা দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল,

তিনি বাগানের একটা বেঞ্চে এসে বসলেন, চারদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল, ঠাণ্ডাও বাড়ছিল, চারদিক নিঃস্তব্ধ হয়ে যাচ্ছিল, এদিক ওদিক শুকনো পাতার উড়ে যাওয়ার শব্দ হচ্ছিল। তার মন নানান ভাবনায় আবিষ্ট হল। হঠাৎ তার মনে হল মিলড্রেড তার স্ত্রী উপরের ঘরে তারই সাথে ছিল অর্থাৎ তার পার্থিব দেহটার সাথে। তিনি আনন্দে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ালেন।

তিনি এবার তার চিন্তাশক্তির সাহায্যে গেব্রিয়েলকে তার কাছে আনতে চাইছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন শব্দে তার চিন্তাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছিল। তিনি কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারছিলেন না। হঠাৎ উপরের দিকে তার স্ত্রীর ঘরের দিকে তাকালেন। তিনি দেখতে পেলেন তার বড় ছেলে চুপিচুপি বারান্দায় বেরিয়ে এল, তার হাতে সেই বাক্সটা, সে বারান্দায় এসে রেলিংয়ের উপর বাক্সটা রেখে আস্তে আস্তে সাবধানে বাক্সটার ডালা খুলে দিল। বাক্সটা থেকে আলোকিত কিছু বেরিয়ে এল। তারপর তিনি দেখলেন আলোটা একটা পুরোন জাহাজের আকার নিল, পাল দাঁড় মই, জাহাজটা বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল, তারপর হঠাৎ জাহাজটা শব্দ করে ফেটে গেল। বিস্ফোরণের পর দেখা গেল তিনটে তিন রঙের আলোর তারা নীচের দিকে নেমে আসছে। গেব্রিয়েল দুহাত পেতে নীল ও সবুজ তারা দুটো ধরে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে গেল। কলডিং তাড়াতাড়ি হাত পেতে লাল তারাটা ধরলেন, কিন্তু লাল তারাটা কিছুক্ষণ হাতে থাকার পর মিলিয়ে গেল।

তারপরই তিনি দেখলেন তার স্ত্রী। অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'একি গিলবার্ট তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ? চল ঘরে চল'। তার হাত ধরে মিলড্রেড বাড়ির দিকে চলতে লাগল।

দরজার কাছে এসে কডলিং দরজার হাতলে হাত রাখলেন, দরজাটা সহজে খুলে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে এলেন, ঘরের দরজা খুলে, ঘরে সিগারেটের গন্ধ। ঘরের যেখানে

যা ছিল সব ঠিক ঠিক জায়গায়। তিনি তার অর্দ্ধসমাপ্ত লেখাটার কাছে গেলেন, যেখানে শেষ করেছিলেন ঠিক সেইখানে আছে। তিনি দরজার কাছে একটা পাল্লা ধরে সামনে পেছনে ঠেলতে লাগলেন। খুব সহজেই দরজাটা সামনে পেছনে সরল।

স্ত্রী ঘরে ঢোকার পর জিজ্ঞেস করলেন ছেলেমেয়েরা কোথায়? উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি ছেলেমেয়েদের ঘরে গিয়ে দেখলেন দুটো খাটে দুজন শুয়ে আছে।

'আর একজন কোথায়'? জিজ্ঞেস করলেন।

'অবাক কাণ্ড, তুমি আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? স্ত্রী বললেন 'তুমি যদি ভাল হও···তবে···।'

'মিলড্রেড'

সে উজ্জ্বল হয়ে মাথা নাড়ল।

'আমরা ওর নাম দেব গেব্রিয়েল' কডলিং বললেন।

'কিন্তু ধর—,'

'না, না' স্ত্রীর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বললেন 'আমি ওর সম্বন্ধে জানি'। তারপর তিনি স্ত্রীকে একটা সুন্দর ছোট্ট গল্প শোনালেন।

[দশ]

আমি আজ বিকেলে নির্ভুল ভাবে জানতে পারলাম আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, আর কোন উপায় নেই। যখন ছেলেটা এসে আমার সাথে কথা বলল তখনই বুঝতে পেরেছিলাম। আমি তখন সেই ধূসর বিকেলে রেলিংয়ে হেলান দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখছিলাম। আমি দেখলাম ছেলেটা জলের ধারে গিয়ে নীচু হল, তারপর আমার

দিকে তাকিয়ে দেখল। ছেলেটার বয়স বার তের হবে। ওর মুখটা বিষণ্ণ, চেহারার কোন আকর্ষণ নেই। তার মুখ দেখে বুঝলাম সে কেঁদেছে। আমি তার মুখটা চিনি।

সে পেছন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসে আমার পাশে দাঁড়াল, তারপর বলল।

'এডি আমার সাথে পশুর মত ব্যবহার করেছে'।

'আমি জানতে পারলাম, আমার সেই বিশেষ জ্ঞানের জন্য। এই আধুনিক জগতে কেউ বিশ্বাস করবে না যে আমি আমার তরুণ বয়সে ক্ষমতার লোভে আমাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলাম, তাই আমি এখন সব জানতে পারি। আমি আমার প্রভুর কেনা চাকর হয়ে গেছি। যখন চুক্তিটা হয়েছিল তখন আমি আমার প্রভুকে দেখতে পাইনি। তিনি অন্যভাবে তাঁর অস্তিত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

সেই চুক্তিটা হয়েছিল ঠিক এইখানে- ডাউনপোর্টের সমুদ্রের ধারে পঁচিশ বছর আগে। আমি এখানে একটা স্কুলে আমার বার তের বছর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলাম। তখন থেকেই বিপদের সময় আমি এখানে চলে আসি। আমার প্রভু বেশ পরিহাস প্রবণ, কেন না এইখানেই আমি আমাকে বিক্রি করার চুক্তি-পত্রে সই করেছিলাম।

আজ বিকেলে ছেলেটা যখন সেই ঘৃণিত নামটা উচ্চারণ করল "এডি আমার সাথে পশুর মত ব্যবহার করেছে" তখনই আমি বুঝতে পারলাম।

আমি আর সেই আগের জীবনে ফিরে যেতে পারি না। কিন্তু এলসপেথ সম্বন্ধে আমি তো কোন চুক্তি করিনি, আমার প্রভু চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। এলসপেথের সঙ্গে আমার ঠিক বন্ধুত্ব ছিল না। এলসপেথ ঐ আত্মসন্তুষ্ট গর্দভ ডোনাল্ড চেভিয়টের সাথে এনগেজ ছিল। আমার প্রভু কিন্তু চুক্তির অন্যান্য শর্তাবলী কঠোর ভাবে আমার উপর আরোপ করেছেন।

আপনার কথা আমি মানি না। আমার বা এলসপেথের ব্যাপারে কোন রহস্য নেই। সবকিছুই ব্যাখ্যা করা যায়। পরের বছর-গুলোতে ওর পাগলামো বেড়েছিল, আমার ওয়াশিংটন মিশন থেকে ফিরে আসার পর। যদিও আমাদের ছেলেপুলে হয়নি তবুও একটা সফল রাজনৈতিক জীবন বিচার করা কঠিন। ঐ সময়টা আমার ভীষণ খারাপ গেছে ওর জন্য ও এমন সব কাণ্ড করত। আমি ওকে অনেক মানসিক চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেছি। হ্যাঁ সব শেষ হওয়ার আগেই আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল, কিন্তু সে জন্য আমাকে দোষ দেওয়া যায় না। না এলসপেথ আত্মহত্যা করেনি। প্রেসক্রিপ-সনের প্রতি ও প্রচণ্ড অবহেলা করত।

একথা আবার তুললাম বলে আমায় মাপ করবেন। আমি আপনার সামনেই বলব এলসপেথকে আপনি ইচ্ছে করে আমাদের দামাদামীর মধ্যে ফেলেছেন। এডি তুমি একটা পশু—তুমি একটা জঘন্য হিংস্র পশু। এখন আমার প্রভু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি না গিয়ে পারবো না।

এলসপেথ মারা যাওয়ায় আমি ডাউন পোর্টে এসেছিলাম। তোমার মনে পড়বে আমার সহকর্মীরা বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বেশ বিবেচক ছিলেন। তখনও পর্যন্ত কেবিনেটে ছিলাম। আমার লণ্ডন থেকে চলে আসার আগে প্রধানমন্ত্রী আমাকে বলেছিলেন তিনি অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী পদে আমাকে নিয়োগ করবেন। তিনি খুব দয়ালু ছিলেন। বলেছিলেন তোমাকে অনেক কাজের ভার দিয়ে দিচ্ছি এসব তোমাকে ব্যস্ত রাখবে এবং দুঃখ ভোলাতে সাহায্য করবে।

কথাটা জেনে আমি এখানে ছিলাম, আমি এককালে এখানকার একজন অখ্যাত অজ্ঞাত অবহেলিত ছাত্র ছিলাম, আর এখন আমি পিভি-কাউন্সিলার।

শুরুতে ফিরে যাওয়া। ওঃ আমি ভুলে গেছি, এটাই আমি বলছিলাম, তোমার কি ধারণা আছে আমি এখানে ছেলেবেলায় কি

প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলাম ?

আমি কষ্ট ভোগ করেছিলাম, জানতাম না কিজন্য আমাকে কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। আমি এখানে কুড়িটা বছর অসহ্য কাটিয়েছি, আমার মাস্টার মশায়রা ছিলেন অত্যাচারী আর অযোগ্য। আমার মা বাবা বাইরে থাকতেন। ওরা সবসময় নিজেদের ঝগড়াঝাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, আমার দিকে নজর দেওয়ার ওদের সময় ছিলনা। ছুটির সময় আমি বৃদ্ধা পিসীর কাছে ছুটি কাটাতাম। স্কুলে আমার চেয়ে বড় এডি লরেন্স নামে একটা ছেলের অধীনে ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতাম।

নাক সিঁটকে ও আমাকে চরম অপমান করত। তুমি শুনেছ, নিশ্চয়ই তা শুনে থাকবে। 'এডি আমার দিকে তাকিয়ে হেসোনা পরিহাস কোর না' আমি একবার স্কুলে এডিকে বলেছিলাম, ও আরও বেশি হেসেছিল। আরও বেশি অপমান করেছিল। সে আমাকে আত্মিকভাবে এবং নৈতিকভাবে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল। আমাকে অনেকের মধ্যে অপমান করে ও মজা পেত। আমাকে উঁচুতে উঠে যেতে বলত তারপর সেখান থেকে লাফ দিতে বলত। আমার চেহারা নিয়ে বিশ্রী ইয়ার্কি মারত।

অবাক হচ্ছ তবুও এই জায়গা আমাকে আকর্ষণ করে বলে। যখন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমি এখানে এলাম তখন নিজেকে জয়ী মনে হয়েছিল, মনে হয়েছিল আমি আমার অতীতকে জয় করেছি। অতীত আমার সাথে দেখা করতে এল। আমাকে বলে গেল আমি কোথা থেকে এসেছি এবং কোথায় যাব। বলে গেল আমি নরক থেকে এসেছি আবার নরকেই ফিরে যাব।

এখন আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। বিষণ্ণ সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশটা বিবর্ণ। এই শহরে যাওয়ার ঐ রাস্তাটা ধরে ছেলেটা আমার দিকে এগিয়ে এল যেন সে আমাকে চেনে এবং আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেউ ওকে পাঠিয়ে দিয়েছে।

"আমাদের স্কুলে একটা নতুন ছেলে এসেছে"—সে বলল, সে আমার চেয়ে বড়। ওর নাম এডি লরেন্স, আমার উপর খুব অত্যাচার করে।

'তোমার নাম কি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেটা বলল 'টমাস এইলডন'।

আলো এসে ওর মুখে পড়েছিল। ওর মুখটা আমার ছেলেবেলার মুখ। টম এইলডনকে তার অত্যাচারী প্রভু আমার কাছে পাঠিয়েছে। আমি সম্মানীয় প্রিভি কাউন্সিলার টমাস এইলডন। আমি ছেলেটার সাথে ওর স্কুলে গেলাম সেটা আমারও স্কুল ছিল।

কিন্তু আমি ডাউনপোর্টে কেন এসেছি? তোমাকে বলতে ইচ্ছে করছে না দলের মধ্যেকার দলাদলির কথা। যদি দল থেকে বাইরে থাকা যায় তবে সমালোচনা করার অধিকার থাকে। আমি বলব এখন এমন একটা সময় যখন দক্ষ ও সাহসী কেউ রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে। ওটাই সেই বুড়ো লোকটা এবং তার দক্ষিণ পন্থী সঙ্গীরা বুঝতে চায় না। আমি এসব বলছি, এসব খুবই গোপনীয়। সাবধান এসব যেন প্রকাশ না হয়ে পড়ে। দলের কার্যকরী সভায় এই সপ্তাহে দু'-তিনটে ঝড় বয়ে গেছে। সত্যি বলছি আমি সপ্তাহ শেষটায় বাইরে চলে এসেছি, কারণ হল আমি আমার পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে ভাবতে চাই। আমার মনে হচ্ছে আমি যখন আঘাত হানব তখন ঐ বৃদ্ধের সমর্থন তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়বে।

ওঃ আলোটা যেভাবে আমার চোখে এসে পড়ল আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম। কেউ বোধহয় হাসছে নাক সিঁটকাচ্ছে।

আমায় চলে যেতে হবে।

হ্যাঁ এডি, হ্যাঁ—আমার প্রভু আমি এক্ষুনি আসছি। এডি তুমি আমার প্রভু আমি তোমার চাকর। আমি তোমার জন্য সব করব—কিন্তু দয়া করে আমাকে পরিহাস করোনা, হেসো না, আমি তা সহ্য করতে পারি না এডি···আমার প্রভু···প্রভু···।

[এগার]

ট্রেনটা যখন গ্র্যাণ্ড সেন্ট্রাল স্টেশন ছাড়ল ফ্রান্সিস ব্যারণ তার পকেট থেকে ছোট দাবা সেটটা বার করলেন, তারপর তিনি দাবার ছকটা নিয়ে ভাবতে বসলেন। ছকে কোন ঘুঁটি ছিল না, তবুও তিনি মনে মনে দাবা খেলে যাচ্ছিলেন। তার জীবনটাও দাবার ছকের সাথে জড়িত। দাবার বইতে লেখা থাকে…'এই ধরনের অসামান্য খেলা প্রথম চালু করেছিলেন ফ্রান্সিস ব্যারণ……।'

এখন তাঁর চল্লিশ বছর বয়সে তিনি চলেছেন দাবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে। উপর থেকে তাঁকে দেখে কিছু বোঝা যায় না। তিনি লম্বা নন, পোযাক-আশাক বাহারী নয়, তবে সুসজ্জিত। তার চেহারার লক্ষণীয় বিষয় হল তার চেহারার তুলনায় বড় মাথা ও রূপোর ফ্রেমের পিছনে তাঁর উজ্জ্বল বড় বড় চোখদুটো।

তাঁর আকৃতির জন্য তার নামকরণ করা হয়েছে 'শক্তিশালী বোড়ে'। তিনি তার প্রথম খেলা থেকে এতদিন পর্যন্ত এই উপাধি বজায় রেখেছেন।

অন্যযাত্রীরা চলে যেতে যেতে তাঁর দিকে উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছিল, তিনি তাঁর কোলে শূন্য দাবার ছকটা নিয়ে ভাবনায় মগ্ন ছিলেন। অন্য বেঞ্চে একটা ছেলে একটা সুন্দর মেয়ের পাশে বসেছিল। সে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খেলবেন নাকি একদান।'

ব্যারণ মুখ তুলে তাকিয়ে বলল 'না ধন্যবাদ'। একথা বলার সময় তিনি তাঁর শূন্য দাবার ছকে বিপক্ষের সাথে মন্ত্রী বিনিময় করে একটা বোর্ডের এডভানটেজ পেয়ে গেলেন। তিনি এই রেলের কামরায় খেলা পছন্দ করেন। খোলা জায়গায় খেলাও তার সুনাম প্রতিপত্তির সাথে

খাপ খায় না। তাছাড়া তরুণদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, তরুণরা ভাল খেলে। আর কিছুদিন পরে তাঁর তরুণদের প্রতি ভয় হতে আরম্ভ করবে। অবশ্য তিনি যেখানে খেলতে যাচ্ছেন সেখানকার সবাই তাঁর চেয়ে বড়। তাঁর এ ব্যাপারে কোন ভয় নেই। তাঁর মনে পড়ে তিনি যখন যৌবনে বিখ্যাত খেলোয়াড় ওরিমুণ্ডকে হারিয়েছিলেন।

তিনি বোধহয় কঠোর ব্যবহার করেছেন ভেবে বললেন, 'আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত।' কথাটা হাস্যকর শোনাল।

'আপনি কি বোস্টনে টুর্নামেন্টে খেলা দেখতে যাচ্ছেন?' তরুণ জিজ্ঞেস করল।

ব্যারণ ইতস্ততঃ করে বললেন, 'হ্যাঁ। আমার সেইরকম আশা আছে।

তরুণ বলল, খেলাটা আশা করা যায় ওরিমুণ্ড, স্যাভার্ড আর ব্যারণের মধ্যে হবে, অন্য কারুর বিশেষ সুযোগ নেই।

ব্যারণের মনে তখন খেলার চাল ঘুরছিল।

তরুণ আবার বলল, 'আমার ওরিমুণ্ডের খেলা ভাল লাগে। পুরোন গ্র্যাণ্ড মাস্টারদের মধ্যে তিনিই শেষ জন। তিনি খুব আক্রমণাত্মক খেলেন। আমি আশা করছি তিনিই আবার চ্যাম্পিয়ন হবেন।'

'তুমি আধুনিক পদ্ধতিতে খেলা পছন্দ কর না?' তরুণকে জিজ্ঞেস করলেন ব্যারণ।

'না না, বড্ড বেশি রক্ষণাত্মক, আমার ভাল লাগে না, তরুণ উত্তর দিল।

'কিন্তু এই পদ্ধতিই জয়যুক্ত হয়।'

তরুণরা খেলার মাধ্যমে পুরোন পদ্ধতির যৌক্তিকতা দেখিয়ে দিতে চাইল।

ব্যারণ বললেন, না 'তার কোন দরকার হবে না।'

তরুণটি বলল, আপনি হয়ত আমায় চেনেন না, 'আমার নাম রিচার্ড জেমস, আন্তর্কলেজ চ্যাম্পিয়ন।'

ও এই তাহলে রিচার্ড জেমস। এর সম্বন্ধে কাগজে পড়েছিলেন, চিকাগোতে হেরে গেলেও পরিচ্ছন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত খেলার জন্য পুরস্কার পেয়েছিল।

তিনি বললেন 'এসো খেলা যাক।'

সুন্দর মেয়েটি বলল 'শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোককে রাজী করিয়ে ছাড়লে'।

তিনি প্রথমে সতর্ক হয়ে খেলতে লাগলেন, কারণ এই ট্রেনের মধ্যে খেলার ফলাফল তার টুর্নামেণ্টের খেলাকে প্রভাবিত করতে পারে।

কিন্তু ব্যারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই নিজের স্টাইলে খেলতে আরম্ভ করলেন। তিনি রিচার্ডের আক্রমণাত্মক খেলার দোষগুলোকে কাজে লাগাতে চাইলেন।

তরুণ জেমস ম্যাক্সল্যাণ্ড পদ্ধতিতে দাবা ছকের মাঝখান দিয়ে আক্রমণ শুরু করল। ব্যারণ ছকের মধ্যে জায়গা পাওয়ার জন্য যুদ্ধ শুরু করলেন। দুজনেই একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন।

তারা যখন খেলার শেষের দিকে এসে গেলেন জেমস একটা দানে পিছিয়ে ছিল, কিন্তু তার আক্রমণের সুযোগ বেশি ছিল।

'আপনি খুব ভাল খেলছেন' জেমস বলল।

ব্যারণ মনে মনে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন, তিনি জিততে চাইছিলেন, তার এই কাজে লাগাতে পারলে জেমস জিতে যাবে। যাই হোক খেলাটা যদি ড্র হয়ে যায়। ঘটনাটা ভীতিকর। জেমস টুর্নামেণ্টে গিয়ে তাকে চিনতে পারবে তারপরেই রটনা হবে, যেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর। তাঁর নার্ভের উপর চাপ পড়বে।

তিনি হঠাৎ বললেন, 'আমি তোমায় আমার নাম বলিনি, আমি ফ্রান্সিস ব্যারণ'।

কথাটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল না। জেমস লজ্জিত হয়ে বললেন, 'আমি আগে যেসব কথা বলেছি সেজন্য আমায় মাপ করবেন'।

'না না কিছু মনে করিনি'।

দুচালের পর জেমস একটা ভুল করল এবং ব্যারণ জিতে গেলেন। তবে তিনি মনে মনে তরুণকে প্রশংসা করলেন।

'আমাদের আবার টুর্নামেন্টে দেখা হবে'। ব্যারণ ব্লাক বে স্টেশনে নেমে গেলেন।

দুজনেই বুঝতে পারলেন ফলটা কি হল। ব্যারণের জয়টা নেহাৎই আকস্মিক।

জেমস তার স্ত্রীকে বলল, 'তিনি ঐ মুহূর্তে আমাকে ওর পরিচিতি জানালেন কেন? নামটা জানার পরেই আমি ঘাবড়ে গেলাম, ভুল করলাম খেলায়।'

ভদ্রলোক জিতবেন বলে নিশ্চিত ছিলেন না, আমি তার মুখ দেখেই বুঝেছিলাম। সেলী উত্তর দিল।

টুর্নামেন্টের সময় ব্যারণকে বেশ শান্ত ও নিরুত্তেজিত দেখাচ্ছিল। যুদ্ধের পর এটাই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। কয়েকটা চেনা মুখকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অন্যদের ব্যারণ চেনেন, ইংলিশ মাস্টার ফ্র্যাশলি, ফ্রান্সের স্যাপর্ড, রাশিয়ার জেসফ, এবং আরও অনেকজন। দ্বিতীয় সারির। কিন্তু দাবায় দ্বিতীয় আর প্রথমের মধ্যে ব্যবধান সামান্য। তিনি এই দ্বিতীয়দের কারুর কাছ থেকে হেরে যেতে পারেন কিন্তু দাবায় চ্যাম্পিয়ান হয় পয়েন্টের উপর। হারলেও খেলার সুযোগ থাকে।

সবশেষে বৃদ্ধ ওরিমুণ্ড, চুল পেকে গেছে। সবসময় কালো স্যুট পরে থাকেন। প্রায় সত্তরের কাছাকাছি বয়স, হাত কাঁপে। তিনি তার মানসিক ক্ষমতাও কিছু অংশে হারিয়েছেন মনে হয়। শোনা যায় তিনি কিছুদিন কনসেনট্রেসান ক্যাম্পে কাটিয়েছেন। তিনি আগের চেয়ে ভদ্র হয়ে গেছেন। করিডোরে দেখা হলে বললেন।

মাস্টার ব্যারণ তুমিও আর তরুণ নেই।

'আমি আবার খেতাবটা পেতে চাই' ব্যারণ উত্তর দিলেন।

'বোধহয় এটাই তোমার শেষবার হবে'। কিছুদিন আগে আমায়

একজন বলেছিল, "আপনি দাবা খেলে সময় নষ্ট করলেন" আমি বলে-ছিলাম "তোমরা কেন লিখে, টাকা উপার্জন করে, ছবি এঁকে সময় নষ্ট কর।" এখন আমি ভাবি আমি কি করলাম, দাবার পিছনে জীবন দিয়ে কি পেলাম।

'আপনি অমর হয়ে গেলেন'—ব্যারণ উত্তর দিল।

'অমর, তাহলে আমার বছর দশেক আগে মারা যাওয়া উচিত ছিল, তুমিও একদিন এটা বুঝতে পারবে মাস্টার ব্যারণ।' শেষ কথাটায় ওরিমুণ্ডের রাগ ফুটে উঠল।

তবে কথাটা ঠিক বলেছেন, চ্যাম্পিয়ান থাকার সময় মরে যাওয়া অনেক সম্মানের ঐ সব তরুণদের কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে।

খেলা আরম্ভ হল। খেলায় কিন্তু কেউ সহজে জিততে পারছিল না, সবাই উত্তেজনায় ভুগছিল এবং ব্যারণ তাদের থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। খেলা যখন শেষ হয়ে আসতে থাকল, তরুণরা আক্রমণাত্মক খেলতে লাগল। কারণ তারা জানে তারা জিততে পারবে না তবুও যদি কোন মাস্টারকে হারানোর খ্যাতি পাওয়া যায়। এই ভাবে ব্যারণ জেসফ আর ফ্র্যান্সীসের কাছে হেরে গেল আর ওরিমুণ্ড হারলেন স্যাভার্ড আর ব্যারণের কাছে।

ব্যারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল। স্যাভার্ডের বিরুদ্ধে সহজে জিতল এবং ওরিমুণ্ডকে হারাতে সামান্য বেগ পেল।

সেলী এবং রিচার্ড তাদের সব খেলায় উপস্থিত ছিল। ব্যারণের মনে হচ্ছিল ওরা যেন তার হারার অপেক্ষা করছে। ট্রেনের কথা তার মনে পড়ছে, তারা অপেক্ষা করছে কখন ব্যারণ ভুল করেন।

ওরিমুণ্ড, স্যাভার্ড, ব্যারণ আর ব্রায়ান শেষ পর্যন্ত থাকলেন। ব্রায়ান সবার কাছে হারল। স্যাভার্ড ব্যারণ আর ওরিমুণ্ডের কাছে হারল। ব্যারণ আর ওরিমুণ্ড ফাইনালে উঠলেন।

ফাইনাল খেলার আগের দিন হোটেলের লবিতে বসে থাকার সময় স্থানীয় দাবা ক্লাবের সম্পাদক ব্যারণের কাছে এলো।

সম্পাদক তাকে তাদের ক্লাবে গিয়ে কয়েকটা খেলার জন্য অনুরোধ করল।

ব্যারণ বললেন খেলতে পারি, তবে এই খেলার খবর যেন প্রকাশিত না হয়। প্রকাশিত হলে আমার উপর বা আমার বিরোধীর উপর তা প্রভাব বিস্তার করবে।

সম্পাদক কথা দিলেন যে এই খেলার ফলাফল কালকের রাত পর্যন্ত কেউ জানতে পারবে না। যারা খেলবেন তাদের কাছেও তাঁর নাম প্রকাশ করা হবে না।

সম্পাদকের আশ্বাসে সন্তুষ্ট হয়ে ব্যারণ কোপলী চেস ক্লাবে গেলেন।

সম্পাদক বলল খেলার ব্যবস্থা হয়ে গেছে ব্যারণকে জোড় সংখ্যায় সাদা ও বিজোড় সংখ্যায় কালো নিয়ে খেলতে হবে।

ব্যারণ রাজী হলেন।

ব্যারণ একটা আলাদা ঘরে বসে চালের নির্দেশ দিতে লাগলেন। কয়েকজন খেলোয়াড় দুর্বল। দশ পনের চালের পরেই ওরা হার স্বীকার করে নিল। আর কয়েকজন একটু বেগ দিল।

কিন্তু সপ্তম খেলোয়াড় লড়তে লাগল। ম্যাক্সল্যাণ্ডের আক্রমণ পদ্ধতি। ব্যারণ খেলার পদ্ধতি চিনতে পারলেন। জেমস কয়েকটা চালের পর আক্রমণে উঠে এল। জেমসের জিতে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হতে থাকল। জেমসও নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

কিন্তু তারপরই রিচার্ড জেমস একটা ভুল করল। ব্যারণ নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন জেমসের খেলা শেষ হয়ে গেছে, তিনি ঘোষণা করলেন আর ছ'চালের মধ্যে তিনি মাৎ করে দেবেন। তাঁর পরিকল্পনা মত তিনি জিতে গেলেন এবং হোটেলে ফিরে এলেন।

কিন্তু মনে মনে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কারণ জেমসের শেষ ভুলটা। যে এত ভাল খেলল সে এরকম একটা সাধারণ ভুল করল কি করে। এর মানে ইচ্ছে করে হেরে যাওয়া। জেমস হয়ত ভেবেছে,

বড় খেলার আগে হারলে বড় খেলার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। তাই ইচ্ছে করে হেরে গেল। কিন্তু এটাতো তার উপর করুণা করা হল।

ব্যারণের ঘুম হচ্ছিল না।

ফাইনালে ওরিমুণ্ড জিতে গেলেন, নিজের আনন্দে পরাজয়ের দুঃখের থেকেও বেশি কাঁদলেন। হতাশ ব্যারণ বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হল। ফাইনাল খেলাটা দেখে সবাই তার দিকে হাসবে।

দরজায় শব্দ হল, রিচার্ড আর সেলী এসেছিল, ওরা জিজ্ঞেস করল শেষ গেমে ব্যারণ এমন খেলল কেন? ব্যারণ কেন নিজের গেমটা ওরিমুণ্ডকে দিয়ে দিলেন?

ব্যারণ হাসিমুখে বলল, তুমি আমাকে খেলা এবং আরও অনেক কিছু সম্বন্ধে গতরাতে আমায় শিক্ষা দিয়েছ জেমস্।

'গতরাতে?' জেমস্ অবাক হল।

'হ্যাঁ, গতরাতে ফোপলী চেস ক্লাবে?'

'আমি, ফোপলী চেস ক্লাবে?

নামই শুনিনি। রিচার্ড জেমস্ বলল।

সবুজ সমুদ্রের ঢেউ পাথরের উপর আছড়ে পড়ছিল। আমি উপরে বসে 'দি স্টোরি অব সান মাইকেলের' গল্প পড়ছিলাম। আমার পিসী আমার থেকে একটু দূরে সমুদ্রস্নান করছিলেন। তিনি যখন ভেসে উঠলেন আমি বই থেকে মুখ তুলে বললাম "টাইরেরীয়াস কত সুন্দর লোকছিলেন জানতে ইচ্ছে করে।"

পিসী বললেন, 'আমি ওর সম্বন্ধে কিছু জানি না বরঞ্চ ওর সম-সাময়িকদের সম্বন্ধে জানি। আমি দ্বীপবাসী দু' একজন লোককে জানি, তাদের সাথে থেকেছি।'

আমি পিসীর সাথে একমত হলাম। টিম্বারিও ওদের স্থানীয় শিল্প। তবে এখন টিম্বারিও পরিষ্কার হয়ে গেছে। ওখানকার ভিলাগুলো আর স্নানাগারগুলো এখন একজন সাধু সম্রাট ভোগ করেন।

আমি তারপর বললাম, 'আমি গুহাগুলোতে যাব, তুমি যাবে নাকি ?'

'না আমি যাব না' গুহাগুলোতে যা হয় ?

পিসী জল থেকে উঠে এসে বললেন, 'আমি ভিলাতে ফিরে যাচ্ছি'।

'আমি যাচ্ছি তুমি যাও'।

পিসী পাহাড়ের ধাপ বেয়ে ভিলার দিকে উঠে যেতে লাগলেন। আমি সমুদ্রে নেমে দ্বীপটার দিকে সাঁতরে গেলাম। একটু দূরে একটা গুহা দেখতে পেয়ে ওটার দিকে সাঁতরে গেলাম। গুহাটার চারদিকে জলের উপরে জলজ উদ্ভিদ গজিয়েছে। আমি জল থেকে উঠে ওগুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। ভেতরটা অন্ধকার, কয়েক পা এগোবার পর আবার আলো দেখতে পেলাম। গুহার একটা প্রবেশপথ আছে তাহলে, আমি স্থানীয় গল্প শুনেছি কিছু গুহা থেকে টিম্বারিও ভিলায় যাওয়ার রাস্তা আছে। আমি ঐ পথটা দিয়ে চললাম, কিন্তু কিছুটা এগোবার পর একটা ঠাণ্ডা বাতাস যেন আমাকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইল। আমি ফিরে চললাম, ভাবলাম দিনের বেলায় আসব। সমুদ্রের ঢেউ গুহার ভেতরে একটা অদ্ভুদ শব্দ করছিল, মনে হচ্ছিল অনেক লোক ভয়ে চীৎকার করছে। আমি আবার জলে নেমে গুহার বাইরের দিকে এগোতে লাগলাম, কিন্তু হঠাৎ আমার মনে হল একটা স্রোত যেন আমায় ভেতরের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমি সাঁতার কাটছিলাম কিন্তু এগোতে পারছিলাম না। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সাঁতার কাটতে কাটতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম। আমি ভাল সাঁতারু নই। আমাকে কি এই গুহার পিচ্ছিলতায় ঠাণ্ডার মধ্যে রাত কাটাতে হবে। কিন্তু জোয়ার এলে আমি তো মারা যাব। তারপর হঠাৎ গুহার মুখের কাছে একটা বিরাট কালো আকৃতির তিমি দেখতে পেলাম, যেন অপেক্ষা করছে। আমি তাড়াতাড়ি পেছনের দিকে সাঁতার কেটে জলের থেকে উঠে পড়লাম। ভয়ে বা ঠাণ্ডায় আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম।

আমি বসে পড়লাম, গুহার মধ্যে ঢেউয়ের শব্দ আরও বাড়ছিল, মনে হচ্ছিল কেউ যেন কথা বলছে। ভয়ে আমার জিভ শুকিয়ে আসছিল।

তারপর গুহার পেছনের দিক থেকে আমি মানুষের গলার স্বর শুনতে পেলাম, সেই সময় ভয়ঙ্কর তিমিটা তার ভয়াল সাদা দাঁত বের করে আমার দিকে তেড়ে এল। আমি ভয়ে গুহার ভেতরের দিকে দৌড়লাম।

কিন্তু এবার ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে আরও বেশি কিছু যেন আমাকে পেছনের দিকে ঠেলছিল। আমি একটা পাথর ধরে থাকলাম। আমি অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করলাম। তারপর অন্ধকারে ফসফরাসের আলোর মত আমি একটা মুখ দেখতে পেলাম। মুখটা আমি চিনি, এর মূর্তি আমি দেখেছি। পেছনে তিমির দাঁতের শব্দ ও জলে লেজ আছড়ানোর প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। তিমিটা যেন জল থেকে উঠে আসছে। প্রত্যেকবার জলে লেজের আঘাতের শব্দে অন্ধকারের মুখটা মুখ টিপে হাসছিল।

ঠেলাটা আরও জোরে আসতে লাগল। কিন্তু আমাকে সরাতে পারল না। আমি জীবন্ত আর যে ঠেলছে সে প্রায় দুহাজার বছর আগে মারা গেছে। তার গায়ের জোর আমার মত হবে না, আমার ভয় হচ্ছিল তিমিটার দাঁতের ও লেজের শব্দ। আমি চোখ বুজলাম, কিন্তু কান তো খোলা থাকল।

কতক্ষণ এই আতঙ্ক চলেছিল আমার মনে নেই। শেষে আমি শুনতে পেলাম গুহার ভেতর থেকে একটা কথা বলার শব্দ হল এবং তিমির ভারী দেহটা জলে পড়ার শব্দ হল। তারপরই সবকিছু চুপচাপ হয়ে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম সেই মুখটা আর নেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি গুহার মুখের দিকে এগোলাম, চাঁদ উঠেছিল। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। জলে আর কোন কালো আতঙ্ক দেখা যাচ্ছিল না। আমি জলে নেমে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠলাম।

পাড়ে কিছুক্ষণ মড়ার মত শুয়ে থাকার পর আমার বইটা তুলে রওনা দিলাম।

আমাকে দেখে পিসী বললেন, 'কতক্ষণ অপেক্ষা করছি, ভেবেছিলাম টিস্বারিও তোমাকে নিয়ে নিলে।'

'সেইরকমই হতে যাচ্ছিল। তুমি শুনে খুশী হবে স্থানীয় লোকেরা যে গল্প করে তা সত্যি।'

পরের দিন আমি নর্মানের সাথে দেখা করে বললাম 'তোমার টিস্বারিও, খুব বেশি নিষ্ঠুর নয়, একটু শুধু মেজাজী।'

নর্মানকে আমার গত সন্ধ্যায় ভয়াবহ বৃত্তান্তের বর্ণনা করলাম।

নর্মান বলল, 'তুমি আরও কয়েকটা গুহা পরীক্ষা করে দেখো টিস্বারিও খুব খারাপ লোক নয়।'

[বার]

শার্লক হোমস তাঁর সম্বন্ধে মাঝে মাঝে অন্য কোন বিশেষণ ব্যবহার করতেন। তাঁর ধারণা উনিই হলেন স্ত্রীজাতির মধ্যে অন্যতম। একমাত্র 'মহিলা' বলতে তাঁকেই তিনি চিনতেন। তবে একথা বলা ঠিক নয় যে, হোমসের মনে প্রেমের অনুরূপ কোন হৃদয়াবেগ জেগে উঠেছে। যে কোন ধরনের চাঞ্চল্য, বিশেষ করে ভালবাসা, এটা ছিল তাঁর স্বভাবের বিরুদ্ধে। এককথায় স্বীকার করা যায়, বিচার-শক্তি ও পর্যবেক্ষণ যুক্তিতে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ এবং নিখুঁত যন্ত্র বিশেষ। তিনি কিন্তু প্রেমের ভূমিকায় অভিনয় করতে একেবারেই অপটু। মানব হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে হোমস বিদ্রূপের সঙ্গে উল্লেখ করতেন। তিনি বলেন, এইসব বৃত্তি দার্শনিকদের কাছেই প্রশংসা পায়, মানুষের উদ্দেশ্য ও কাজের আবরণ উন্মোচন করার পক্ষে

এখন খুবই কার্যকরী কিন্তু শিক্ষিত যুক্তিবাদীর নমনীয় সুনিয়ন্ত্রিত মনোজগতে এইসব আবেগের অনধিকার প্রবেশ ঘটলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে যা তার মানসিক কার্যফলে সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারে।

.বলা যেতে পারে খুব সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধুলো বাড়লে বা জোরালো চশমার কাঁচ ফেটে গেলে দারুণ অসুবিধায় পড়তে হয়, গোলমালের সৃষ্টি হয়। এই প্রবল আবেগের দোল তাঁর সংযত স্বভাবে এর চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক। তবুও স্বর্গীয়া আইরিন অ্যাডলার তাঁর চোখে ছিলেন 'রমণী শিরোমণি'। তাঁর স্মৃতির সঙ্গে নিন্দা ও সন্দেহ জড়িয়ে আছে।

কিছুদিন হল হোমসের সঙ্গে আমার বড় বেশি দেখা হত না। এই বিচ্ছিন্নতার মূল কারণ ছিল আমার বিবাহ। হোমস ছিলেন ছন্নছাড়া। তাই সামাজিক প্রথাগুলি ছিল তাঁর দুচোখের বিষ। কিন্তু নববধূর আকর্ষণে আমি হয়ে পড়েছিলাম ঘরকুনো। অবাধ সুখে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম। হোমস তাঁর বেকার স্ট্রীটের বাড়িতে আজও বাস করছেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পালা করে কোকেন সেবন ও তারপর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার পেছু ধাওয়া করা, অর্থাৎ তীব্র মাদকের অবসন্নতা ও পরক্ষণেই আগ্রহান্বিত স্বভাবের প্রচণ্ড উৎসাহ তাঁকে ঘিরে রইল। এখনও তিনি নিয়ম মাফিক অপরাধ-তত্ত্ব নিয়ে ব্যস্ত। বেতনভোগী পুলিশ যে সব ঘটনার রহস্য উদ্ধার করতে পারতো না তিনি তাঁর অফুরন্ত কৌশল ও আশ্চর্য পর্যবেক্ষণ শক্তি সেসব কাজে নিয়োজিত করতেন।

আমার কানে মাঝে মাঝে একটু আধটু খবর আসতো। যেমন ট্রিফ হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে ওডেসাতে তাঁর তলব, ট্রিঙ্কোম্যালিতে অ্যাটকিনসদের দুর্ঘটনার মীমাংসা করা এবং সর্বশেষে ওলন্দাজ রাজ পরিবারের সেই রহস্য যা তিনি যত্নের সঙ্গে উন্মোচন করেন। অনেক পাঠক যেমন তাঁর কার্যাবলী সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পড়েছে, আমিও ঠিক তাই জেনেছি। হতে পারে হোমস আমার বহুদিনের পুরনো বন্ধু

এবং সহচর। কিন্তু এর থেকে বেশি কিছু জানা আমার সম্ভব হয়নি।

১৮৮৮ সালের ২০শে মার্চ।

তখন আমি আবার ডাক্তারি শুরু করেছিলাম।

বেকার স্ট্রীট দিয়ে রোগী দেখা শেষ করে ফিরছিলাম। বাড়ির সেই দরজাটি নজরে এলে মনে পড়ে গেল আমার বিবাহের ব্যাপারেও 'স্টাডি ইন স্কার্লেট' গ্রন্থে বর্ণিত ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলির কথা। হোমসকে দেখার বাসনা আমার মনে হঠাৎ দারুণ ভাবে জেগে উঠলো। তাছাড়া তিনি তাঁর অসাধারণ প্রতিভাশক্তিকে বর্তমানে কেন কাজে লাগাচ্ছেন না সেটা জানারও ইচ্ছা হল।

বাড়ির উপর তলার দিকে তাকালাম। ঘরে আলো জ্বলছে। দু-দু'বার পর্দার গায়ে এসে পড়লো তাঁর দীর্ঘ রোগা চেহারার ছায়া। তিনি দ্রুত ও ব্যগ্রভাবে পায়চারি করছেন। মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, হাতদুটি পেছনে পরস্পরে বন্দী। তাঁর স্বভাবের সঙ্গে আমার অনেক দিনের ওঠা-বসা। তাই বুঝতে আমার দেরী হলো না, তিনি আবার কাজে নেমেছেন। নেশার ভাব কেটে তিনি নতুন সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

আমি আর অপেক্ষা না করে দ্রুত ঘণ্টা বাজালাম। পরমুহূর্তে এসে পৌঁছলাম তাঁর ঘরে। অবশ্য এই ঘরের অর্দ্ধেক ভাগীদার আমিও ছিলাম।

আমায় দেখে হোমস খুশী হলেন বুঝলাম, কিন্তু তাঁর ব্যবহারে উচ্ছ্বাস ফুটে উঠলো না। তিনি ইশারায় একটা চেয়ারে বসতে বললেন। তারপর সদয়ভাবে চুরুটের বাক্সটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে কোণের মদের পাত্রের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। আগুনের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মসমাহিত দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

—বিয়েটা হয়ে তোমার দেখছি সুফল হয়েছে। থমথমে গলায় হোমস মন্তব্য করলেন, বিয়ের পর সাড়ে সাত পাউণ্ড ওজনে বেড়েছো।

—সাড়ে সাত নয়, সাত পাউণ্ড। আমি জবাব দিলাম।

—একটু বেশি ভেবেছিলাম, কি বল? তবে তেমন ফারাক নেই। আবার ডাক্তারি শুরু করেছ। কিন্তু আমাকে তো জানাও নি?

—না জানালে জানলে কি করে বল?

—অনুমান করে দেখছি। আচ্ছা বলতে পারো, কদিন আগে বৃষ্টিতে ভিজেছো আর তোমার বরাতে জুটেছে একটা আনাড়ি ঝি?

আমি বললাম, ভায়া, বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কয়েক শতাব্দী আগে তোমার জন্ম হলে তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হতো। ঠিকই বলেছো, গত বৃহস্পতিবার অনেক কষ্টে বাড়ি ফিরতে হয়েছে। কিন্তু আমি তো সেসব পোশাক পরে নেই, তুমি জানলে কি করে? আর আমার দাসী মেরি জেন পাল্টাবার নয়। তাই গিন্নীর হুকুমে সে কাজে ইস্তফা দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, তুমি এতসব জানলে কি করে, বুঝতে পাচ্ছি না।

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে হোমস মুচকি হাসলেন। তারপর রোগা হাতদুটি ঘসে বললেন—এমন কি শক্ত ব্যাপার। তোমার বাঁ পায়ের জুতোর ভিতরদিকটায় দুটি সমান্তরাল আঁচড়ের দাগ আছে। খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে কোন অসাবধানী লোক কাদা তোলার জন্যে জুতোর সোলটার ঐ অবস্থা করেছে।

···এর থেকে ধারণা হলো, প্রথমতঃ তোমাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেরোতে হয়েছিল। এবং দ্বিতীয়তঃ অনুমান হলো তোমার ঐ দাসী পাদুকা বিদ্বেষিণী। আর ডাক্তারির কথা জানলাম কি করে? যদি কোন ভদ্রলোক আইডোফর্মের গন্ধ নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেন, তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলে নাইট্রেট অব সিলভারের কালো দাগ থাকে আর তাঁর টুপির ডগা উঁচু দেখে স্টেথোসস্কোপ কোথায় রেখেছেন জানা যায়, তাহলে কি আমার বুদ্ধি এতই ভোঁতা যে তাঁকে একজন পেশাদার চিকিৎসক বলে ধরতে পারবো না?

হোমসের সহজ বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যাখ্যা দেখে আমি হো হো করে

হেসে উঠলাম। তারপর বললাম, সত্যি, তুমি যখন ব্যাপারটা যুক্তি কারণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও তখন বেশ মজা লাগে। মনে হয়, এ তো আমিও বিনা পরিশ্রমে ধরতে পারতাম। কিন্তু আমি তা সম্পুর্ণ ভাবে ধরতে পারি না, তোমার পদ্ধতির ব্যাখ্যা না শুনে। কিন্তু আমার অনুমান, আমার দৃষ্টিশক্তি তোমার মতই তীক্ষ্ণ।

হোমস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। একটা চুরুটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বললেন—ঠিক বলেছো। তবে তুমি দেখ, পর্যবেক্ষণ কর। এখানেই তফাত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জল থেকে এই ঘরে ওঠার সিঁড়িগুলো তুমি অনেকবার দেখেছো, তাই তো?

—হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি।

—অনেকবার মানে?

—মানে কয়েকশো বার তো হবেই।

—বলতে পারো কটা ধাপ আছে?

—কটা? তা বলতে পারি না।

— কি এবার বুঝতে পারছো। তুমি কেবল সিঁড়িগুলো দেখেছো, কিন্তু পর্যবেক্ষণ করনি। তোমাকে আমি এই কথাটাই বোঝাতে চাইছি। কিন্তু আমি সিঁড়িগুলো দেখেছি এবং সেইসঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছি। সিঁড়িতে সতেরোটা ধাপ আছে।

…যাক ওসব কথা, তুমি আমার সঙ্গে অনেকবার কাজে ছিলে, আমার সামান্য দু'একটা অভিজ্ঞতা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে। আশা করি এ বিষয়টাও তোমার মনে কৌতূহল সৃষ্টি করবে।

মোটা গোলাপি কাগজের একখানা চিঠি হোমস আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। এতক্ষণ টেবিলের ওপর চিঠিটা পড়ে ছিল। তিনি বললেন—এটা শেষ ডাকে এসেছে। জোরে জোরে পড়ো।

আমি তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুললাম। তারিখ বা কারোর স্বাক্ষর ঠিকানা কিছুই লেখা নেই। কেবল লেখা আছে, 'আজ রাত্রি পৌনে আটটা নাগাদ একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

তিনি এক অত্যন্ত জটিল সমস্যায় পড়েছেন এবং আপনার সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করতে চান। সম্প্রতি আপনি ইউরোপের কোন একটি রাজপরিবারের যে বিষয়ের মীমাংসা করেছেন তার গুরুত্ব অতি-রঞ্জনের অপেক্ষা রাখে না। তেমন কাজ দিয়ে আপনার ওপর ভরসা করা যায়। আপনার সম্পর্কে এই জাতীয় আস্থা সর্বত্র। অতএব উল্লিখিত সময়ে বাড়িতে অপেক্ষা করবেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী মুখোস পরে গেলেও ভয় পাবেন না।

—ব্যাপারটার মধ্যে রহস্যের গন্ধ রয়েছে। তুমি কি বল ? আমি মন্তব্য করলাম।

—আপাতত কিছু না। কোন তথ্য হাতে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করা বিরাট ভুল। তথ্যের সাহায্যে কল্পনা শক্তিকে চালিত না করে, কল্পনার সারা তথ্যকে বিকৃত করা মানুষের স্বভাব। এবার চিঠিটা দেখে বলো, তোমার কি মত ?

আমি আমার সহচরের পদ্ধতি অনুসরণ করে বললাম—কাগজটা যেমন শক্ত তেমনি মজবুত। এই চিঠির কাগজ খুব দামী, কম করেও আধ ক্রাউন হবে। অতএব পত্রলেখক অর্থবান।

—আন্দাজ করেছো ঠিক। সত্যি এমন কাগজ ইংল্যাণ্ডে পাওয়া যায় না।

হোমস আলোর সামনে চিঠিটা ধরতে বললেন। আমি সেই মত করতেই দেখলাম একটা বড় হাতের E একটা ছোট হাতের s-এর সঙ্গে রয়েছে। একটা p-ও আছে। তাছাড়া ছোট একটা t-এর সঙ্গে বড় হাতের G-ও রয়েছে। সবটা কাগজেই নকসা করা।

হোমস প্রশ্ন করলেন—আন্দাজ করতে পারছো ?

—মনে হয় কারিগরের নাম অথবা তার মনোগ্রাম।

—বলতে পারলেনা। বড় G-এর সঙ্গে ছোট -এর অর্থ হলো গেসেলশাফট্। জার্মান ভাষায় এর মানে কোম্পানি। আমরা যেমন কোম্পানি কথাটা সংক্ষেপে লিখি 'কোং' তেমনি এটাও। p মানে

পেপার। এখন বাকি রইল E s-এর অর্থ বের করা। কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ারখানা ঘেঁটে দেখি।

তাকের উপর থেকে ঢাউস আকারের একটা বাদামি রঙের বই নামিয়ে আনলেন হোমস।

—ইগ্লো, ইগ্লোনিৎস, এই যে ইগ্রিয়া। কার্লসবাদের কাছে বোহেমিয়া। এ দেশের ভাষা জার্মান। জায়গাটা ওয়ালেস্স্টাইনের মৃত্যুর স্থান। তাছাড়া অনেক কাঁচের কারখানা এবং কাগজের মিলের জন্য বিখ্যাত। তারপর এক ধমক হেসে নিয়ে বললেন, বল এবার কি মনে হয়?

এক ঝলক নীল ধোঁয়া হোমসের গাল থেকে ছাড়া পেয়ে উড়ে গেল।

আমি তার কৌতুকদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কাগজটা বোহেমিয়ার তৈরি।

—খানিকটা ঠিক। পত্রলেখকও একজন জার্মান। চিঠি লেখার কায়দাটা দেখেছো? এমন অদ্ভুত ভাবে চিঠি লিখতে কোন ফরাসী বা রাশিয়ান পারতো না। কেবল বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহার করে জার্মানরা। এই বোহেমিয়ান কাগজে চিঠি লিখেছে যে মুখোসপরা জার্মান, তার উদ্দেশ্য কি, সেটাই অজ্ঞাত রয়ে গেল। আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তবে সব সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি নিজেই আসছেন।

হোমসের শেষ কথাগুলি মিলিয়ে যেতে না যেতেই শোনা গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। সেই সঙ্গে গাড়ির চাকার ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ।

পরমুহূর্তেই ঘন্টায় টান পড়লো। হোমস শিস দিলেন। শব্দ শুনে মনে হল জুড়ি।

জানালা দিয়ে চোখ বাড়ালেন হোমস। তারপর বললেন—ঠিক, সুন্দর একটা ছোট ব্রুহাম গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। ঘোড়া দু'টোর এক একটির দাম কমপক্ষে দেড়শো গিনি হবে। ওয়াটসন, এ মামলায় আর কি আছে জানি না, তবে পয়সা আছে।

—এখান থেকে আমার চলে যাওয়া উচিত,

—তোমাকে যেতে দিলে তো ডাক্তার। সঙ্গী হিসেবে একজন জীবনীকার না থাকলে যে সবটাই ভেস্তে যাবে। তাছাড়া এমন চিত্তাকর্ষক মামলার সান্নিধ্য না হলে পরে অনুতাপ করবে।

—কিন্তু তোমার মক্কেল—?

—সে ভাবনা আমার। তোমার সাহায্য আমার প্রয়োজন। তাঁরও দরকার হতে পারে। ঐ তিনি আসছেন। মন দিয়ে শোন সব।

শোনা গেল ধীর ও গম্ভীর পদধ্বনি। সিঁড়ির দিক থেকে ভেসে এসে দরজার সামনে এসে থামলো। তারপরেই দরজায় সজোরে টোকা পড়লো।

হোমস বললেন—ভিতরে আসুন।

ঘরে প্রবেশ করলেন, এক দীর্ঘ চেহারার জার্মান, সাড়ে ছ-ফুটের বেশি ছাড়া কম হবেন না। তাঁর হাত-পা-বুক দেখে মনে পড়ে যায় হারকিউলেসের কথা। পরণে অত্যন্ত দামী পোশাক। কিন্তু অতিরিক্ত চটকদারী পোশাকে মনে হয়, রুচির অভাব আছে। পুরু চওড়া অস্ট্রাখানের পটি তার ডবলব্রেস্ট কোটের হাতার এবং সামনের কলারের শোভা বর্ধন করছে। নীলরঙের একটা ক্লোক ঝুলছে তাঁর কাঁধের ওপর, লাইলিংগুলি আগুন রঙের সিল্কের। কাঁধে সেগুলিকে আটকে রেখেছে একটা ব্রোচ, একটা দামি ফিরোজা পাথর ঝকঝক করছে ব্রোচটিতে। বাদামি রঙের ফারে মোড়া বুটজোড়া পায়ের মাঝামাঝি অংশ ঢেকে রেখেছে। সব মিলিয়ে একটা কুরুচির বন্য ভাব প্রকট ভাবে ফুটে উঠেছে। চওড়া পাড়ওয়ালা একটা হ্যাট তাঁর হাতে এবং একটি কালো মুখোস তাঁর আধখানা মুখ ঢেকে রয়েছে। তখনও তাঁর অন্য হাতটি মুখোসের কাছেই। তাই মনে হলো, ঘরে প্রবেশ করার পূর্বমুহূর্তে তিনি মুখোসটি লাগিয়েছেন। পুরু দুই ঠোঁট, লম্বা সোজা চিবুকে দৃঢ়তা ও একগুঁয়েমির ছাপ প্রবলভাবে ফুটে উঠেছে, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক মুখ।

—আমার পাঠানো চিঠি কি পেয়েছিলেন, লিখেছিলাম আমি

সাক্ষাৎ করতে আসবো ? তিনি কর্কশ কণ্ঠে জার্মান উচ্চারণে বললেন।

আমাদের দুজনের দিকে তিনি পালাক্রমে তাকাতে লাগলেন। খুব সম্ভব বুঝতে পারছেন না, কাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলবেন।

—দয়া করে আসন গ্রহণ করুন। হোমস বললেন। ইনি আমার সহচর ও সহকর্মী ডাক্তার ওয়াটসন। বহু ব্যাপারে আমি ওঁর সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু বলবেন কি, আমি কার সঙ্গে কথা বলছি ?

—কাউন্ট ফন ক্র্যাম বলে ডাকতে পারেন। আমি বোহেমিয়ার একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। আমি কি একান্ত গোপনীয় কথাও আপনার ঐ বন্ধুর সামনে বলতে পারি ? ইনি নিশ্চয় আপনার অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ?

এবার আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, চলে যাওয়াই উদ্দেশ্য। কিন্তু হোমসের হাতের টানে আমাকে আবার বসে পড়তে হলো।

—আমাকে যা বলতে চান, তা ওঁর সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। যা শুনবো দুজনে, নতুবা নয়।

এবার জার্মান ভদ্রলোক তাঁর চওড়া কাঁধজোড়া আন্দোলিত করে বললেন—বেশ, আমি বলতে পারি। কিন্তু একটা সর্ত, এই ব্যাপারটা অন্ততঃ দু-বছরের জন্যে গোপন রাখতে হবে। এর পরে অবশ্য এর কোন মূল্য থাকবে না। কিন্তু বর্তমানে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা সমস্ত ইউরোপের ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। আমি একটুকুও বাড়িয়ে বলছি না।

হোমস বললেন—আপনার সর্তে রাজী।

—আমিও।

মক্কেলটি শুরু করলেন—মুখোস কেন পরেছি জানেন ? যে সম্মানিত ব্যক্তিটি আমাকে দূতরূপে পাঠিয়েছেন, তিনি চান আমার পরিচয় গোপন থাক। তাই কিছু মনে করবেন না। তবে সঠিক পরিচয় যে আমি এখনও দিইনি, তা মেনে নিচ্ছি।

হোমস শান্ত কণ্ঠে বললেন—জানি।

—ব্যাপারটা অত্যন্ত গোপনীয়। কেলেঙ্কারিটা জানাজানি হয়ে গেলে একটি রাজপরিবার আজীবন বহন করবে দুর্ণামের কলঙ্ক। তাই সবদিক থেকে সাবধান হতে হয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, বিষয়টা বোহেমিয়ার বংশানুক্রমিক রাজবংশ অর্জস্টাইন পরিবারের সঙ্গে জড়িত।

চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে হোমস বললেন—ধরতে পেরেছি।

আগন্তুক হোমসের স্থির, শায়িত দেহের দিকে তাকালেন সবিস্ময়ে। বুঝতে দেরী হলো না, কেন লোকে তাঁকে একজন বিচক্ষণ বিশ্লেষক ও উদ্যমশীল ডিটেকটিভ রূপে আখ্যা দেয়।

হোমস ধীরে ধীরে চোখ মেললেন। হারকিউলিস চেহারার আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে বললেন—মহারাজ, দয়া করে মামলার বিবরণগুলো বলুন। তাহলে পরামর্শ দিতে সুবিধা হয়।

এবার আগন্তুক উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠলেন। চেয়ার ছেড়ে কয়েকবার গম্ভীর মুখে পায়চারি করলেন। তারপর নিরাশ হয়ে মুখোসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রায় চীৎকার করে বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন, আমিই রাজা। কেন আমি আমার পরিচয় গোপন রাখবো?

হোমস শান্ত ভাবে বললেন—সেটাই স্বাভাবিক। কেন আপনি করবেন? মহারাজ কিছু বলার আগেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে ভিলএলম্ গটসরাইল সিজিসমণ্ড ফন আর্মস্টাইন, ক্যাসল ফেলস্টাইনের গ্র্যাণ্ড ডিউক এবং বোহেমিয়ার রাজা আমার সামনে উপস্থিত।

আমাদের রহস্যময় মক্কেলটি তাঁর শ্বেত শুভ্র প্রশস্ত ললাটে হাত বুলিয়ে আবার আসন গ্রহণ করলেন।

—আমি এসব কাজে খুব পারদর্শী নই, বুঝতেই পারছেন। কিন্তু কোন প্রতিনিধির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলাম না। ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে আমাকে তার ফাঁদে পড়তে হত। তাই আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রাহা থেকে ছুটে এসেছি।

হোমস চক্ষু মুদিত করে বললেন—এবার শুরু করুন আপনার বক্তব্য।

—সংক্ষেপে বলি। আপনি নিশ্চয়ই বিখ্যাত অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারকে জানেন? প্রায় পাঁচ বছর আগেকার কথা। ভাসৌ নগরে আমি অনেকদিন ছিলাম। সেই সময় আমার পরিচয় ঘটে আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে।

হোমস চোখ বন্ধ করা অবস্থায় বললেন—ডাক্তার, আমার নামের তালিকাটা নিয়ে এসো তো।

অনেক কাল থেকে হোমস উল্লেখযোগ্য মানুষ এবং বিষয় সম্বন্ধে চুম্বক লিখে রাখতেন। ফলে কোন মানুষ বা বস্তুর নাম করে তাঁকে অসুবিধাতে ফেলা সম্ভব ছিল না।

আমি একজন ইহুদি অধ্যাপকের ও সামরিক অফিসারের নামের মধ্যে আইরিন অ্যাডলারের নাম খুঁজে পেলাম। অতল সমুদ্রের মাছ সম্বন্ধে এই সামরিক অফিসার প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন।

হোমস বললেন—দেখি? হুঁ। জন্মসাল ১৮৫৮, নিউজার্সিতে। কণ্ট্রেলটো—জুম লা স্কালা। ইম্পিরিয়াল ভাসৌ রঙ্গমঞ্চের প্রধান গায়িকা। থিয়েটার থেকে অবসর নিয়েছেন—জুম। লণ্ডনে বাস করছেন। বুঝলাম। মহারাজ, আপনি নিশ্চয়ই এই তরুণীটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। নিশ্চয়, এখন আপনার লেখা চিঠিগুলো ফেরত চাইছেন।

—ঠিক তাই, কিন্তু কি করে সম্ভব?

—গোপনে বিয়ে হয়েছিল?

—উহুঁ।

—আইনসঙ্গত কোন দলিল বা সার্টিফিকেট

—কিছু না।

—তাহলে? মহারাজ, এই যুবতীটি যদি কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত

হয়ে অথবা অর্থলোভে চিঠিগুলো হাজির করেন, সেগুলো যে আপনার কি করে প্রমাণ হবে ?

—আমার হাতের লেখা দেখে।

—বাজে। জাল করেছে।

—আমার প্যাডের কাগজ প্রমাণ দেবে।

—প্যাডের কাগজ চোরাই।

—সীলমোহর ?

—নকল।

—আমার ফটো ?

—কিনতে পাওয়া যায়।

—আমাদের দুজনের একসঙ্গে ফটো আছে।

—মহারাজ, আপনি অবিবেচকের পরিচয় দিয়েছেন। কি বিপদ !

—তখন আমি দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম, হারিয়ে ফেলেছিলাম কাণ্ডজ্ঞান।

—মারাত্মক ভাবে জড়িয়ে পড়েছেন দেখছি।

—এখন আমার বয়স মাত্র তিরিশ। তখন আরো তরুণ ছিলাম, ছিলাম যুবরাজ।

—ছবিটা হাতে আনতে হবে।

—অনেক চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।

—তবে মহারাজ আপনার কিছু টাকা খরচ হবে। ছবিটা কিনতে হবে।

—বিক্রি করতে সে নারাজ।

—তবে একমাত্র উপায় চুরি করা।

—সে চেষ্টাও করা হয়েছে, একবার নয়, পাঁচবার। দুবার দাগী চোর দিয়ে ওর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজিয়েছি। একবার দেশ ভ্রমণের সময় তার মালপত্র সরিয়েছিলাম। দুবার রাস্তায় ওৎ পেতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু একবারও সফল হইনি।

—হদিস পাননি ?

—একদম না।

হোমস হেসে বললেন—ব্যাপারটার মধ্যে বেশ মজা আছে তো।

কথাটা শুনে রাজা তৃপ্ত হলেন না। বললেন, আমার কাছে এটা অত্যন্ত গুরুতর।

—অবশ্য ঠিক। বলতে পারেন, মহিলাটি ঐ ছবি দিয়ে কি করতে চান ?

—আমার সর্বনাশ।

—কেমন করে ?

—আমার বিয়ের সময় আসন্ন।

—আমারও কানে এসেছে।

—স্ক্যানডিনেভিয়ার রাজার মেজো মেয়ে ক্লটিলডি লয়ম্যান ফন্ সাক্সি মেনিঙ্কেনের সঙ্গে আমি বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ। তাঁদের বংশের গোঁড়ামির কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। অত্যন্ত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। আমার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের সামান্য ছায়াও ব্যাপারটা ভেঙে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।

—আইরিন অ্যাডলারের কি ইচ্ছা ?

—ছবিটা তাদের কাছে পাঠিয়ে দেবে বলে ভয় দেখাচ্ছে। আর একাজ সে করতে পারে তা আমি জানি। ওর মুখটা অসাধারণ সুন্দর, কিন্তু ওর মন লোহার মত কঠিন, সম্ভবতঃ একজন পুরুষের মনও অত কঠোর হয় না। আমার ক্ষতি করার জন্য ও সব কিছুই করতে পারে।

—আপনি ঠিক জানেন যে তিনি এখনও ছবি পাঠান নি ?

—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

—কি করে জানলেন ?

—সে জানিয়েছে আগামী সোমবার ছবিটা পাঠাবে অর্থাৎ ঐ দিনে আমার বাগদান প্রকাশ্য ভাবে ঘোষিত হবে।

—বেশ। তাহলে হাতে আরও তিনদিন সময় আছে। একটা হাই তুলে হোমস বললেন—ভালই হল। হাতে দু'একটা জরুরী মামলা আছে। আপনি নিশ্চয়ই লণ্ডনে থাকবেন?

—হ্যাঁ। ল্যাংহামে আমার পরিচয় কাউন্ট ফন ক্র্যাম।

—বেশ, কতদূর এগোলাম, আপনাকে জানাব।

—দয়া করে জানাবেন। আপনার পথ চেয়ে আমি বসে থাকব।

—এবার পারিশ্রমিকের কথা বলুন।

—আপনি যা বলবেন।

—তাই নাকি?

—আমি ঐ ফটো হাতে পেলে, আপনাকে রাজ্যের একটা জেলা দিতে প্রস্তুত।

—আপাততঃ খরচ সম্বন্ধে বলুন।

রাজা তাঁর পোশাকের আড়াল থেকে বের করে নিয়ে এলেন শ্যাময় চামড়ার ভারি ব্যাগ। সেটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন—এর মধ্যে মোট তিনশো পাউণ্ডের স্বর্ণমুদ্রা আছে। এছাড়া সাতশো পাউণ্ডের নোট আছে।

নোটবইয়ের পাতা ছিঁড়ে একটা রসিদ লিখে হোমস তাঁর হাতে দিয়ে বললেন—ঐ গায়িকার ঠিকানাটা বলতে পারেন?

—ব্রায়োনি লজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউ, সেণ্ট জন্‌স্ উড।

হোমস ঠিকানাটা টুকে নিলেন। তারপর বললেন—আরেকটা প্রশ্ন আছে, ফটোটা ক্যাবিনেট সাইজের তো?

—হ্যাঁ।

—তাহলে মহারাজ, শুভরাত্রি। আশা করি শীঘ্রই আপনাকে কোন সুসংবাদ জানাতে পারবো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজার ব্রুহাম গাড়ির চলার শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

হোমস বললেন—ওয়াটসন, আপাতত আসি। আগামী কাল এ

বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। তুমি যদি কষ্ট করে বিকেল তিনটের সময় আসো, ভালো হয়।

আগামী কাল যথাসময়ে গিয়ে আমি হাজির হলাম। কিন্তু হোমস বাড়িতে অনুপস্থিত।

বাড়িওয়ালী জানাল, সকাল আটটার কিছু পরে তিনি বেরিয়ে গেছেন। অতএব স্থির করলাম, আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে তবে যাব। চুল্লির পাশে এসে বসলাম। এই কেসের ফলাফল সম্বন্ধে আমি খুব আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিলাম। তবে বর্তমান মামলাটা আমার আগের দুটি অভিজ্ঞতার মত ভয়ানক ও বিচিত্র নয়। তবুও মামলাটার স্বরূপ ও মক্কেলের পদমর্যাদা যে মামলাটাকে বিশেষত্বমণ্ডিত করেছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার বন্ধুর এই বর্তমান মামলাটি ছাড়াও তাঁর স্বাভাবিক উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও অন্তর্ভেদী যুক্তি অনুসরণ স্পৃহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে আমি তাঁর কার্যপ্রণালী এবং জটিল রহস্যগুলির গ্রন্থি উন্মোচন পদ্ধতির পর্যালোচনা করে গভীর আনন্দ লাভ করি। তাঁর অবশ্যম্ভাবী সফলতা সম্বন্ধে আমি এতই নিশ্চিত ছিলাম যে তার ব্যর্থতার কথা ক্ষণিকের জন্যও ভাবতে পারি না।

ঢং ঢং করে চারটে ঘণ্টা পড়লো। এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলো বিশ্রী চেহারার এক সহিস। পরণে নোংরা পোশাক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, টকটকে লাল। এমন ভাবে পা ফেলছে, মনে হয় মাতাল। আমার বন্ধুর ছদ্মবেশ ধারণ করার আশ্চর্য ক্ষমতার সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম ঠিকই, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি দেখে চিনতে পারলাম না। তিন তিনবার তাকানোর পর

আমি তাকে আবিষ্কার করলাম। মাথা হেঁট করে আমায় অভিবাদন করে বিদায় নিলেন।

পাঁচ মিনিট চুপচাপ বসে রইলাম। শয়ন ঘরের পর্দা তুলে উঠলো। টুইড স্যুট পরা এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। পকেটে হাত ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে আগুনের চুল্লির দিকে এগিয়ে গেলেন। পর মুহূর্তে প্রাণ খোলা হাসিতে ফেটে পড়লেন।

—ভায়া, সত্যি! একথা বলতে বলতে আবার তিনি হেসে উঠলেন। হাসির দমকে তাঁর দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম। নিজেকে সামলাতে না পেরে শোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

—এত হাসছো কেন? কি হয়েছে?

—দারুণ মজা হয়েছে ভায়া। আমি হলফ করে বলতে পারি আজ সকালে কি করেছি এবং তার কি ফল হয়েছে—তুমি তা আন্দাজ করতে পারবে না।

—ঠিকই বলেছো। তবুও অনুমান করছি শ্রীমতী অ্যাডলারের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলে আর তার বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলে।

—মিলেছে। কিন্তু পরিণামটা অসাধারণ। শোন, আজ সকালে, প্রায় আটটা নাগাদ সহিসের বেশ ধরে বাড়ি থেকে বেরোলাম। এটা নিশ্চয়ই জানো, ওদের দলে ভিড়তে পারলে সবকিছু জানা যায়। গাড়োয়ান আর সহিসের মধ্যে আশ্চর্য টান আর সহানুভূতি আছে। অতএব চট করে খুঁজে পেলাম ব্রায়োনি লজ।

…খুব বড় বাড়ি নয়, পেছনে এক টুকরো বাগান। একেবারে রাস্তার উপর পর্যন্ত দোতলা দরজায় চাব-এর তালা ঝুলছে। ডানদিকে বেশ বড় বৈঠকখানা, সাজানো-গোছানো। মানুষ সমান এক-একটা জানালা মেঝে থেকে উঠেছে, শিশুরাও অতি সহজে তা খুলতে পারে। আস্তাবলের উপর থেকে দালানের আস্তাবলে যাওয়া চলে, এটাই বাড়ির পেছনের উল্লেখযোগ্য জিনিস। বাড়িটা আমি খুব মন দিয়ে লক্ষ্য করেছি, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। কিন্তু তেমন আকর্ষণীয় জিনিস নজরে পড়েনি।

···শেষ পর্যন্ত পথে পথে ঘুরতে লাগলাম। একটা সরু রাস্তা গলির ভেতর থেকে বাগানের পাঁচিল ঘেঁষে চলে গেছে। আমি এটা আগেই অনুমান করেছিলাম। তখন সহিসরা তাদের ঘোড়া নিয়ে ব্যস্ত, কেউ তাদের পরিষ্কার করছে, কেউ ছোলা খাওয়াচ্ছে। আমি ওদের হাতে হাত লাগালাম। আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ওরা আমাকে নগদ দু'পেনি, আধ বোতল মদ এবং দুবারের মত তামাক। এছাড়া মিস অ্যাডলারের সম্বন্ধে দরকারি খবর জানলাম। আশেপাশের কয়েক-জনের জীবন চরিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুনতে হল।

আমি আর কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম—আইরিন অ্যাডলার সম্বন্ধে কি জানলে ?

—ও একজন মহিলা বটে। এমন মন বিজয়িনী রমনী ধরাধামে নেই। স্থানীয় লোকেদের টনক নড়িয়ে দিয়েছেন। সার্পেন্টাইন মিউজের প্রত্যেকের এক বক্তব্য। চুপচাপ নিজের মনেই থাকেন, কনসার্টে গান করেন। রুটিন মাফিক পাঁচটায় বেরোন এবং ডিনারের সময় ঠিক সাতটায় বাড়ি ফেরেন। একমাত্র গান গাইতেই রাস্তায় বেরোন। তাঁর একমাত্র পুরুষ বন্ধু রূপবান ও তেজীয়ান। গায়ের রঙ একটু ময়লা। রোজই আসেন। একবার তো আসেনই, কোন কোন দিন একের বেশিও যাতায়াত করেন। সেই পুরুষটি হলেন গডফ্রে নর্টন, একজন আইনজ্ঞ।

···এবার বুঝতে পারছ, সহিসের বন্ধুত্ব কত মূল্যবান। তারা তাঁর সব খবরই জানে। হাজার বার সার্পেন্টাইন মিউজ থেকে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আমি এবার সহিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম বাড়ির সামনের দিকে। মনে মনে মতলব আঁটছি, কি করে অভিযানে নামা যায়। মনে হল গডফ্রে নর্টন এব্যাপারে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মিস অ্যাডলারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি, কেন তিনি বারবার যাতায়াত করেন ? ভদ্রমহিলা কি তাঁর মক্কেল, বান্ধবী না প্রেমিকা ? যদি প্রথম অনুমানটা ঠিক হয়—তাহলে ফটোটা তাঁর

হাতেই আছে। আর যদি দ্বিতীয়টা মেলে তাহলে ওসব চিন্তার প্রয়োজন নেই। তাঁর অফিসে হানা দেওয়া অথবা ব্রায়োনি লজে অনুসন্ধান চালানোর ওপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে। এই অস্বস্তিকর ব্যাপারটা আমার অনুসন্ধানের পরিধি বাড়িয়ে দিল। এত খুঁটিনাটি বিবরণ শুনতে নিশ্চয়ই তোমার বিরক্ত লাগছে। কিন্তু ব্যাপারটার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে হলে এসব ছোটখাট অসুবিধা-গুলির কথা বলা দরকার।

—আরে না না, আমার ভালোই লাগছে। মন দিয়ে শুনছি। তুমি বল। আমি উত্তর দিলাম।

—আমি যখন সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ব্রায়োনি লজের সামনে। এক অসাধারণ রূপাবন ভদ্রলোক গাড়ি থেকে লাফ্ দিয়ে নামলেন। গায়ের রঙ একটু ময়লা, নাক বাঁকা এবং গোঁফ আছে। বুঝলাম, ইনিই সেই গডফ্রে নর্টন। অত্যন্ত ব্যস্ত মনে হল। চিৎকার করে গাড়োয়ানকে অপেক্ষা করতে বলে বাড়ির সদর দরজায় এসে আঘাত করলেন। এক-জন দাসী দরজা খুলে দিতে তিনি তার পাশ কাটিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তাঁর গতিবিধি দেখে মনে হল, বাড়ির সবকিছুই তার খুব ভালভাবে চেনা।

বৈঠকখানার জানালা দিয়ে আমি তাঁকে মাঝে মাঝে দেখতে পারছিলাম। মেয়েটিকে একদম দেখা যাচ্ছিল না। ভদ্রলোক উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিলেন, হাত নাড়ছিলেন, কথা বলছিলেন। আধ ঘণ্টা পর ভদ্রলোক আগের চেয়ে আরও ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন লজ থেকে। গাড়িতে উঠতে গিয়ে একটা সোনার ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন। তারপরই গাড়িতে বসে চীৎকার করে বললেন—যত জোরে পার চালাও। প্রথমে রিজেন্ট স্ট্রীটে গ্রস অ্যাণ্ড হ্যাঙ্কির ওখানে। তারপর এজওয়ার রোডে সেন্ট মণিকা গির্জায় যাবে। কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে আধ গিনি বখশিস পাবে।

…গাড়িটা চলে যেতেই ভাবলাম, পেছু ধাওয়া করব কিনা। এমন সময় একটা চকচকে ল্যাণ্ডো সেখানে এসে থামলো কোচম্যানের কোর্তার বোতাম আধখানা লাগানো, কানের নিচে গলাবন্ধনী ঝুলছে, ঘোড়ার সাজের ডগাগুলো বখলস থেকে বেরিয়ে এসেছে। সম্পূর্ণ থামার আগেই গাড়িতে এসে বসলেন শ্রীমতী অ্যাডলার। তাঁর মুখের কিছুটা আমি দেখলাম। সত্যি অমন সুন্দর মুখের জন্যে লোকে প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

…তিনি চিৎকার করে বললেন—জন, দ্রুত গাড়ি চালাও। বিশ মিনিটের মধ্যে সেণ্ট মণিকা গির্জায় পৌঁছে দিলে পাবে বাড়তি আধ পাউণ্ড।

…এমন সুযোগ হাতছাড়া বোকামি হবে। তাই ভাবছি অন্য গাড়িতে বসে রওনা হবো, না কি ওঁর গাড়িতেই উঠে বসবো। হঠাৎ একটা গাড়ি রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। গাড়োয়ানটা কয়েবার তাকালো ছেঁড়া পোশাক পরা যাত্রীটির দিকে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম। বললাম—সেণ্ট মণিকার গির্জায় চলো। বিশ মিনিটে পৌঁছে দিলে আধ পাউণ্ড বাড়তি মিলবে।

…তখন বারোটা বাজতে মাত্র পঁচিশ মিনিট বাকি। অতএব ব্যাপারটা কি সেটা সহজেই অনুমেয়।

…দ্রুত ঘোড়া ছুটলো। এত তাড়াতাড়ি গাড়ি ছুটছে, এর আগে কখনো এমনভাবে চলেছি বলে মনে হয় না। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেখি, বাইরে ল্যাণ্ডো আর ক্যাব দুটো দাঁড়িয়ে। ঘোড়াগুলো হাঁপাচ্ছে। আমি ভাড়াপত্র মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত গির্জায় প্রবেশ করলাম। গির্জা ফাঁকা, কেবল তিনটি প্রাণী সেখানে উপস্থিত—পাদ্রীসাহেব এবং ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। বেদীর সামনে ত্রিভুজের ভঙ্গিমায় তিনজনে দাঁড়িয়ে। পাদ্রীর কথায় অভিযোগের সুর। আমি একপাশে এমন ভাবে পায়চারি শুরু করলাম, যেন একজন সাধারণ লোক অলস কৌতূহল নিয়ে প্রবেশ করেছে। হঠাৎ তিনজনে আমার দিকে

তাকালেন। গডফ্রে নর্টন আমার দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসছে। আমি আশ্চর্য হলাম।

…ভদ্রলোক বললেন—হে ভগবান। এসো এসো, তোমাকেই প্রয়োজন যে।

…আমি বললাম—কি ব্যাপার?

…কোন কিছু জানতে চেয়ো না। এখন এসো বাপু। মাত্র তিন মিনিটে কাজ না সারলে ব্যাপরাটা নিয়মের বাইরে হয়ে যাবে।

…আমাকে প্রায় জোর করে তিনি বেদীর কাছে নিয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তখনও বুঝে উঠতে পারি নি। ইতিমধ্যে কানে একটার পর একটা এসে প্রবেশ করলো মন্ত্র-উচ্চারণ। আমিও দাঁতে দাঁত রেখে সেগুলো বলতে লাগলাম। এমন সব ব্যাপারে সাক্ষী থাকছি যে বিষয়ের আমি কিছুই জানি না। তার মানে আমি অবিবাহিত গডফ্রে নর্টনের সঙ্গে অনূঢ়া আইরিন অ্যাডলারের বিবাহে সাধারণ ভাবে সহায়তা করছি।

…নিমেষের মধ্যে কাজটা শেষ হয়ে গেল। আমার ওপর পাদ্রী সাহেব দারুণ খুশী হলেন। এদিকে বর এবং কনের পক্ষ থেকে পেলাম অসংখ্য ধন্যবাদ। এমন বেকায়দায় জীবনে কোনদিন পরিনি ভেবে নিজের মনেই হাসি পাচ্ছে। মনে হয় আইনগত ভাবে ওদের বিয়ের মধ্যে কোন ত্রুটি ছিল। তাই পাদ্রী সাহেব সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দিতে গররাজি ছিলেন। কিন্তু আমার উপস্থিতিতে বর হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁকে আর রাস্তায় রাস্তায় লোক খুঁজে বেড়াতে হলো না। পাদ্রীর কাছ থেকে পুরস্কার স্বরূপ পেয়েছি এক পাউণ্ড। ওটা আমার ঘড়ির চেনে বাঁধিয়ে রাখবো, এটা এই ঘটনার স্মৃতি হিসেবে থাকবে।

আমি বললাম—বাঃ, দারুণ ব্যাপার। ভাবাই যায় না। তারপর?

—বুঝলাম, নববধূ নিয়ে ভদ্রলোক এবার কেটে পড়লেন। তাহলেই সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। অতএব চটপট কাজ শেষ করতে হবে। যাই হোক, তাঁরা একসঙ্গে হেঁটে এলেন গির্জার দরজা পর্যন্ত।

তারপর বর চলে গেলেন তাঁর অফিসে আর তাঁর বধুটি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। যাবার আগে কেবল বলতে শুনলাম 'অন্যদিনের মত আজও আমি বিকেলে গাড়ি করে পার্কে যাব'। তারা যে যার পথে পা বাড়ালে, আমিও ভাবতে ভাবতে ফিরে এলাম নিজের আস্তানায়।

তারপর কলিং বেল টিপে হোমস অর্ডার দিলেন—একগ্লাস বিয়ার আর বাসি মাংস। তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—কাজের মধ্যে ডুবে থাকায় খিদে তৃষ্ণার কথা বেমালুম ভুলে গেছি। বিকেলে সম্ভবত সময় হবে না। ও হ্যাঁ, ডাক্তার, এবার তোমার সাহায্য প্রয়োজন।

সউল্লাসে লাফিয়ে উঠে বললাম—রাজী।

—আইন মেনে চলবে তো ?

—নিশ্চয়ই।

— যদি গ্রেপ্তার হতে হয়, তবুও না ?

—ভাল কাজ হলে তাতেও না।

—আমার উদ্দেশ্য খুবই চমৎকার।

—তাহলে আমি তৈরি।

—তোমার সাহায্য আমি পাবো, সেবিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলাম।

—এবার শুনি তোমার মতলবটা।

—বলছি। একটু সবুর কর। মিসেস টার্ণার খাবারের ট্রেটা আগে দিয়ে যাক।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলের ওপর হাজির করলো খাবার। তিনি ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে ঘুরে বসে বললেন, খেতে খেতেই ব্যাপারটা আলোচনা করা যাক। হাতে সময় খুবই কম। পাঁচটা বাজে। দু' ঘন্টার মধ্যে হাজির হতে হবে কার্যক্ষেত্রে। শ্রীমতী আইরিন—এখন তাকে ম্যাডাম বলাই উচিত। সাতটার সময় বাড়ি ফিরবেন। তার আগে ব্রায়োনি লজে হাজির হতে হবে।

—তারপর ?

—পরের কথা আমি আগেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে না। শুধু একটা বিষয়ে আমি জোর খাটাবো। তুমি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই ?

—আমি কি স্ট্যাচু হয়ে থাকবো ?

—ঠিক তাই। মনে হয় আপত্তিকর কিছু ঘটবে। তোমার তাতে মাথা না গলানোই ভাল। আমাকে কেবল বাড়িতে ঢুকতে সাহায্য করবে। বৈঠকখানার জানালা কয়েক মিনিটের মধ্যে খুলে যাবে। তুমি ঐ খোলা জানালার আশেপাশেই থাকবে।

—তাই হবে।

—তুমি আমার ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে, আমিও তোমাকে চোখের আড়াল করবোনা।

—যথা আজ্ঞা।

পকেট থেকে চুরুটের মত লম্বা ধরনের একটা জিনিস বের করে হোমস বললেন—আমি যখন এরকম ভাবে হাত তুলবো তখন তুমি এই জিনিসটা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই 'আগুন আগুন' করে চেঁচিয়ে উঠবে। বুঝতে পেরেছো ?

আমি ঘাড় নাড়লাম।

—এটা তেমন সাঙ্ঘাতিক কিছু নয়। সাধারণ প্লাম্বারদের ধোঁয়া ভরা হাউই, দু'দিকে ক্যাপ লাগানো আছে। নিজে নিজেই জ্বলে ওঠে। ব্যস, একটুকুই তোমার কাজ। আর শোনো, তোমার 'আগুন আগুন' চীৎকার শুনে নিশ্চয়ই অনেক লোক এসে হাজির হবে। তখন তুমি রাস্তার একপাশে সরে আসবে। আর আমিও দশ মিনিটের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। তোমাকে ঠিক বোঝাতে পেরেছি তো ?

—আচ্ছা, একবার তামিল দিচ্ছি শোন। প্রথমে নির্লিপ্ত থাকবো, তারপর জানালার কাছে দাঁড়াবো, তোমাকে নজরে নজরে রাখবো। তোমার ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র এটা ছুঁড়বো। তারপর 'আগুন আগুন'

বলে চেঁচাবো। রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবো।

—গুড।

—তাহলে তুমি আমার সম্বন্ধে নিশ্চিত থাকতে পারো।

—খুব ভাল কথা। এই নতুন অভিনয়ে যোগদানের সময় মনে হয় আসন্ন।

হোমস তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলো এক সরল প্রকৃতির, অমায়িক, সাদাসিধে পাদ্রি সাহেব। পরণে ঢিলে প্যাণ্ট, সাদা গলাবন্ধনী, মাথায় চওড়া কালো টুপী, চোখ দুটিতে ঝড়ে পড়ছে সহানুভূতি। বহুভাবাপন্ন কৌতূহলী হাসি এমন চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল যে একমাত্র জন হেয়ারের পক্ষেই তা সম্যকভাবে ফোটানো সম্ভব। হোমস কেবল যে তার বেশ পরিবর্তন করেছিলেন তা নয়, তাঁর অভিব্যক্তি, চলাফেরা, এমন কি অন্তঃকরণও যেন প্রত্যেকটি কৃত্রিম সজ্জার সঙ্গে মানিয়ে গিয়েছিল। স্বীকার করতে বাধা নেই, হোমস অপরাধ তত্ত্বকে পেশারূপে গ্রহণ করায় বিজ্ঞান-জগৎ একজন নিখুঁত বিশ্লেষক ও রঙ্গমঞ্চ একজন নিখুঁত অভিনেতাকে হারিয়েছে।

সন্ধ্যা সওয়া দুটা নাগাদ বেকার স্ট্রীটের বাড়ি থেকে বেরুলাম। সার্পেন্টাইন অ্যাভিনিউতে যখন হাজির হলাম তখনও আমাদের হাতে দশ মিনিট সময়। গৃহস্বামিনীর ফিরে আসার পতীক্ষায় আমরা লজের আশেপাশেই চক্কর মারতে লাগলাম। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। আমি হোমসের বিবরণের সঙ্গে বাড়িটা মিলিয়ে দেখলাম, একটুও ফাঁক নেই। ভেবেছিলাম জায়গাটা নিরিবিলি হবে, কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যে। সরু ছোট রাস্তাটা আশ্চর্যজনক ভাবে জনবহুল। এক কোণে ময়লা পোশাক পরা একদল লোক ধূমপান করতে করতে হাসি মস্করা করছিল। ধার দেবার চাকা সমেত একজন কাঁচি শানওয়ালাও ছিল। দুজন

প্রহরী একজন নার্সের সঙ্গে রঙ্গালাপে ডুবে আছে। কয়েকজন সৌখীন পোশাক পরা যুবক চুরুট মুখে ঘোরা ফেরা করছিল।

বাড়ির সামনে আরেকটু এগোতে এগোতে হোমস মন্তব্য করলেন —দেখ ওয়াটসন, বিয়েটা হয়ে ভালই হলো। ব্যাপারটা সহজ হয়ে উঠেছে। এখন ফটোটা দো-ফলা ছুরির মত দুদিকে কাটবে। ওটা যাতে গডফ্রে নর্টনের নজরে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন মহিলা। আবার অপরদিকে আমাদের মক্কেল চাইছেন, ওটা যেন রাজকুমারীর হাতে এসে না পড়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ছবিটা কোথায় আছে ?]

—কোথায় থাকতে পারে ?

—উনি নিশ্চয়ই ওটা কাছে নিয়ে বেড়াচ্ছেন না। ক্যাবিনেট সাইজের ছবি, অতএব পোশাকের অভ্যন্তরে রাখাও সুবিধের নয়। তাছাড়া তিনি জানেন, রাজা তাঁকে বন্দী করে দেহতল্লাসী করতে পারেন। এর আগে দুবার হয়েছেও। অতএব এটা আমাদের চিন্তার বাইরে রাখতে পারি।

—তাহলে কোথায় রাখতে পারেন ?

—ব্যাঙ্কার কিংবা উকিল—দুজনের কাছে থাকা সম্ভব। কিন্তু সন্দেহ রয়েছে। কেননা মেয়েরা গোপন জিনিস নিজের কাছেই রাখে, প্রকাশ করতে চায় না। তাছাড়া তিনি অন্য কারো হাতে ফটোটা দেবেন কেন ? তিনি আত্মবিশ্বাসী বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্না। তাছাড়া রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আছে এমন পেশাদার লোককে তিনি কিছু বলতে পারেন না। আর এটা ভুলে গেলে চলবে না, ওটা তিনি কিছুদিনের মধ্যে কাজে লাগাবেন বলে ঠিক করেছেন। অতএব সময় মত যাতে চট করে পান, তাই হাতের কাছেই রাখবেন। সেই জায়গাটা তার বাড়ি ছাড়া কোথাও নয়।

—বাড়িটা দু'বার তল্লাস করা হয়েছে।

—রাখো, ওদের তল্লাসি। ওরা খোঁজার কায়দাই জানে না।

—বেশ তো, তোমার খোঁজার কায়দাটা শুনি।

—আমি ওসব করবো না।

—তবে?

—উনি যাতে স্বেচ্ছায় দেখাতে বাধ্য হন, সেই ব্যবস্থা করবো।

—সম্ভবতঃ তিনি রাজী হবেন না।

—আপত্তি করার ফুরসৎ পাবেন না। ঐ শোনা যাচ্ছে চাকার আওয়াজ। শ্রীমতীর গাড়িই আসছে। আমি ঐ শব্দের সঙ্গে পরিচিত। ওয়াটসন তুমি এবার আমার নির্দেশ পালনের জন্য তৈরি হও।

রাস্তার মোড় থেকে একঝলক আলো এসে পড়লো আমার চোখে। ঝকঝকে একটা ছোট ল্যাণ্ডো এসে থামলো ব্রায়োনি লজের সামনে। গাড়ি থামতেই হাসি মস্করা-রত লোকেদের মধ্যে একজন এসে দরজা খুলে দিল। কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্যে ছুটে আসা আরেকজন তাকে গুঁতো মেরে সরিয়ে দিল। বাড়তি পয়সা আয় করতে সবাই চায়। অতএব লেগে গেল ঝগড়া। একজনের পক্ষে প্রহরী দুজন, আরেক-জনের দিকে শানওয়ালা। দেখতে দেখতে বেশ জমে উঠলো। ঘুষা ঘুষিও চললো।

ভদ্রমহিলা গাড়ি থেকে নামতেই বাধা পেলেন। একদল ক্রুদ্ধ লোক উত্তেজিত হয়ে তাঁকে ঘিরে ধরলো। তারপরেই শুরু হল লাঠি আর হাতের দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এ ওকে মারে, ও ওকে ঘুষি মারে, মহিলা পড়লেন মুশকিলে। হোমস মহিলাকে উদ্ধার করার জন্যে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে শোনা গেল তার কাতর চীৎকার, মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে টাটকা রক্ত। হাওয়া খারাপ দেখে প্রহরী দুজন আর নিষ্কর্মার দলরা সরে পড়লো, ভদ্রবেশী লোকগুলো এতক্ষণ দূর থেকে সব লক্ষ্য করছিল। এবার এগিয়ে এলো। আইরিন অ্যাডলার দ্রুত পায়ে অন্দরে প্রবেশ করলেন। চকিতে ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। হল ঘরের বিদ্যুতালোকে তার অপরূপ রূপলাবণ্য আরোও মাধুর্যময়ী হয়ে উঠেছিল।

শোনা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর—বেচারার কি ভীষণ লেগেছে ?

কে একজন বললো—শেষ হয়ে গেছে।

অন্য একজন বললো—এখনও ধুকধুকানি আছে। তবে হাস-পাতালে নিয়ে যাওয়ার আগে শেষ হয়ে যাবে।

শোনা গেল একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর—আহা বেচারা! এই সাহসী লোকটি না থাকলে এতক্ষণে ঠাকরুণের ব্যাগ আর ঘড়ি লোপাট হয়ে যেতো।

—যত্ত সব বদমাইশ গুণ্ডার দল। এখনও নিঃশ্বাস ফেলছে দেখছি।

—দিদিমণি, ওকে ভেতরে নিয়ে যাবো। রাস্তায় তো ফেলে রাখা যায় না।

হ্যাঁ, বৈঠকখানায় নরম শোফাটায় ওঁকে শুইয়ে দাও। নিয়ে এসো।

ধীরে ধীরে হোমসকে হলঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। বাইরে থেকে বড় জানালাটা দিয়ে আমি সব দেখতে পাচ্ছিলাম। আলো জ্বললো। কিন্তু জানালার পর্দা সরানো হল না। ফলে শায়িত হোমস আমার নজরেই ছিল। নিজের অভিনয়ের জন্যে হোমস অনুতপ্ত হচ্ছিলেন কিনা জানি না। তবে মহিলাটিকে যখন দেখলাম অত্যন্ত দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে আহতের সেবায় ব্যস্ত তখন নিদারুণ লজ্জা এসে আমাকে গ্রাস করলো, তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু হোমসের কথায় অবাধ্য হতে পারি না, তাই মনকে দৃঢ় করলাম। অলেপকেট থেকে ধোঁয়ার হাউই পটকাটা বের করতে করতে ভাবলাম, আমরা তো মহিলার কোন ক্ষতি করতে চাই না। উনি যাতে অন্যের ক্ষতি না করেন, সেই চেষ্টাই করছি।

হোমস শোফার উপর উঠে বসলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া দরকার। একজন পরি-চারিকা জানালাটা খুলে দেওয়ার পরক্ষণেই আমি সঙ্কেত পেলাম। হোমস হাত উঁচু করেছেন। আমি দেরী না করে হাউইটা ঘরের

মেঝেয় ছুঁড়ে দিয়ে 'আগুন আগুন' করে চীৎকার করে উঠলাম। আমার চেঁচামেচি শুনে আশপাশ থেকে ছুটে এলো ইতর, ভদ্র, সহিস, দাসীর দল। তারাও সমস্বরে 'আগুন আগুন' বলে চেঁচাচ্ছে। গল গল করে জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

পলকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম কয়েকজন পালাচ্ছে। সেই সঙ্গে কানে ভেসে এলো হোমসের আশ্বাস বাণী—অনর্থক ভয় দেখানো ছাড়া ব্যাপারটা কিছুই নয়।

আমি জনকোলাহল থেকে দূরে সরে এলাম। হোমসের নির্দেশ মত স্থানে এসে দাঁড়ালাম। মিনিট দশেক পরে হোমস এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে। আমরা দুজনে পায়ে পায়ে এগোলাম। ঝামেলা কাটিয়ে যখন চলে এসেছি তখন দুজনেই মহাখুশী। এডওয়ার রোডে যাতে পৌঁছনো যায় এমন রাস্তায় এসে হাজির হলাম।

—ডাক্তার, নিখুঁত তোমার অভিনয়। চমৎকার হয়েছে। হোমস বললেন।

—ছবিটা পেয়েছো নিশ্চয়ই?

— না, তবে কোথায় আছে সেটা জেনেছি।

—কি করে?

—আমাকে কিছুই করতে হয়নি। আমি তো আগেই বলেছি শ্রীমতী নিজেই দেখাবেন। ঠিক তেমনটি হয়েছে।

— নাঃ, আমি এখনও একই ঘোরের মধ্যে ডুবে আছি।

হোমস হাসতে হাসতে বললেন—আর রহস্য বাড়িয়ে কাজ নেই। আজকের এই নাটকে রাস্তার ঐ লোকগুলো আমার নির্দেশেই অভিনয় করেছিল। ওদের সহযোগিতায় কাজটা এগিয়েছে।

—কিছুটা অনুমান করেছিলাম।

—গণ্ডগোল শুরু হতেই আমি এগিয়ে যাই, তার আগে হাতের তালুতে নিয়ে নিয়েছিলাম তরল লাল রঙ। দু' হাতে মুখ চেপে ধরতেই এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হলো।

—এটাও আমি সন্দেহ করেছিলাম।

—আমার অবস্থা দেখে শ্রীমতী লজের ভেতরে নিয়ে যেতে বাধ্য হলেন। আমি অবশ্য তার বৈঠকখানা ঘরটাই সন্দেহ করেছিলাম। তবে তাঁর শয়নকক্ষও হতে পারতো। কোন্ ঘরে আছে সেটা বের করার জন্য আমি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। আমাকে শোফায় শুইয়ে দিতে হাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম। ফলে জানালা খোলা হলো। আর তোমারও সুযোগ মিলে গেল।

—কিন্তু তোমার লাভ কি হল?

—আরে ভায়া, ওটাই তো চাইছিলাম। বাড়িতে আগুন লাগলে মানুষ কি করে? সে তার গোপন মূল্যবান জিনিস রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষের এই দুর্বলতম প্রবৃত্তির কথা আমার অজানা নয়। এবং এটা আশ্রয় করে আমি অনেক কাজে সিদ্ধিলাভ করেছি। ডার্লিংটনের কেলেঙ্কারির ব্যাপারে এটা আমার কাজে লেগেছিল। আর্মসওয়ার্থ কাস্‌লের ক্ষেত্রেও তাই। এসব ক্ষেত্রে বিবাহিতা মহিলারা তাদের বাচ্চাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে, কুমারী মেয়েরা রক্ষা করে তাদের গয়নার বাক্স। আর এক্ষেত্রে এই মহিলাটির যে ফটোটাই একমাত্র মূল্যবান জিনিস সেটা আন্দাজ করতে পারি অতি সহজে। আগুনের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি নিশ্চয়ই ছুটে যাবেন।

…তোমার চিৎকারটা দারুণ হয়েছিল। ঐরকম আওয়াজ আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী লৌহকঠিন স্নায়ুকে কাঁপিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। ভদ্রমহিলার ওপর চিৎকারটা বেশ প্রতিক্রিয়া করেছে। ঘণ্টার দড়ির ঠিক উপরে একটা আলগা তক্তার পেছনের একটা ছোট খাঁজে ছিল ছবিটা। তিনি সেদিকে ছুটে গিয়ে আধখানা ফ্রেম টেনে বের করলেন। আমি এক পলকে সেটা লক্ষ্য করলাম। যখন বললাম ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মিথ্যে চিৎকার। তখন তিনি সেটা রেখে দিয়ে হাউইটার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আর তাঁকে দেখতে পাইনি। অনেক ফন্দি-ফিকির করে কেটে

পড়লাম ওখান থেকে। ভাবছিলাম, ফটোটা এই মুহূর্তে আত্মসাৎ করবো কিনা। কিন্তু কোচম্যান ঘরেই ছিল। আমার দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে ছিল। ভাবলাম না, এখন তাড়াহুড়ো করে নিয়ে লাভ হবে না। বেশি ব্যস্ততা দেখালে সব ভেস্তে যাবে।

—আমি জানতে চাইলাম—এবার কি করণীয় ?

—আমাদের অনুসন্ধানের কাজ এখানেই শেষ। আগামী কাল মহারাজকে নিয়ে আসবো। তুমিও আসতে পারো। খুব সম্ভব আমাদের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করতে হবে। শ্রীমতী এসে দেখবেন, আমরা নেই। ফটোগ্রাফটাও নেই। মহারাজ স্বহস্তে ছবিটা উদ্ধার করতে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবেন।

—কটার সময় আসবে ?

—সকাল আটটা। আশা করি, শ্রীমতী অত সকালে বিছানা ছেড়ে উঠবেন না। তাহলেই স্বাধীনভাবে কাজ করা যাবে। তবে খুব দ্রুত কাজ শেষ করতে হবে। বলা যায় না, বিবাহের পর শ্রীমতীর অভ্যাস পরিবর্তন হতে পারে। যাক, আমি আজই একটা চিঠি লিখে রাজাকে আসতে বলে দিচ্ছি।

একসময় দুজনে এসে হাজির হলাম বেকার স্ট্রীটে। বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হোমস পকেটে হাত ঢোকালেন চাবি বের করার জন্য।

হঠাৎ শোনা গেল—"শুভরাত্রি মিস্টার শার্লক হোমস !"

তখন ফুটপাথে অনেক লোকের সমাগম। মনে হল অলেস্টার-পরা একজন রোগা ছোকরা এই অভিবাদন করে গেল। সে তাড়া-তাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

রাস্তায় ম্লান আলো জ্বলছে। হোমস তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন—গলার স্বর চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকটা কে হতে পারে।

আমি সেদিন আর বাড়ি ফিরলাম না। হোমসের সঙ্গেই রাত কাটালাম।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙলো। দুজনে টোস্ট আর কফি নিয়ে বসেছি, এমন সময়ে বোহেমিয়ার মহারাজ ঘরে ঢুকলেন।

শার্লক হোমসের দুই কাঁধে হাত রাখলেন, বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন—ওটার হদিস পেলেন ?

—এখন অব্দি না।

—আশা কি করা যায় ?

—মনে করছি।

—তাহলে আর দেরী করে কাজ নেই। আমি ক্রমশঃ উতলা হয়ে উঠছি।

—একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে।

—আমার ব্রুহাম নীচেই আছে। ভাড়া গাড়ির প্রয়োজন নেই।

—আর কিছু বলার নেই।

তিনজনে নিচে নেমে এলাম।

ব্রুহাম ছুটলো ব্রায়োনি লজের দিকে।

—আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গেছে। হোমস হাসলেন।

—বিয়ে! কবে ?

—গতকাল।

—ভদ্রলোকটি কে ?

—গডফ্রে নর্টন, ব্রিটিশ আদালতের আইনজ্ঞ।

—কিন্তু আইরিন তো তাকে ভালবাসতে পারে না।

—আশা করি তিনি ভালবাসেন।

—আপনি এতটা ভাবছেন কি করে ?

—ভাবছি এই কারণে, মহারাজ এর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক আশঙ্কার হাত থেকে রক্ষা পাবেন। আইরিনের পক্ষে স্বামীকে ভালবাসার অর্থ হল মহারাজকে ভাল না বাসা। আর যাঁকে তিনি ভালবাসেন না তাঁর কাজে হাত বাড়াবার আগ্রহ তাঁর নিশ্চয়ই থাকবে না।

—যুক্তিটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু তবু···আহা! কি মোহময়ী রূপ। আমাদের বিয়ের মধ্যে একমাত্র বাধা ছিল আমার সমান তার বংশমর্যাদা নেই। সত্যি, রানী হিসেবে তাকে দারুণ মানাতো।

মহারাজ চুপ করলেন। বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত মুখ। সার্পেন্টাইন অ্যাভেনিউতে গাড়ি থামার আগে পর্যন্ত মহারাজ একটি কথাও বললেন না।

একসময়ে গাড়ি এসে থামলো ব্রায়োনি লজের সামনে। দরজা খোলা। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা। ব্রুহাম থেকে আমাদের নামতে দেখে তার ঠোঁটে ঝিলিক দিয়ে উঠলো তাচ্ছিল্যের হাসি। এগিয়ে এসে বললো—মিস্টার শার্লক হোমস নিশ্চয়ই আপনার নাম?

হঠাৎ প্রশ্ন শুনে আমার বন্ধু থতমত খেয়ে পরিচারিকাটির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। বললেন—আমিই মিস্টার হোমস।

—আপনি আসবেন, গিন্নিমা এমনটা অনুমান করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ অভিমুখে রওনা হয়েছে। আজ ভোর সওয়া পাঁচটার সময়ে তিনি চেয়ারিং ক্রস স্টেশনে হাজির হন।

—কি! বিস্ময় ও নিরাশার ধাক্কায় শার্লক হোমসের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

—তার মানে, তিনি ইংলণ্ড ছেড়ে চলে গেছেন।

—আর কোনদিন ফিরে আসবেন না।

এবার মহারাজার ভাঙা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—কাগজপত্রগুলো নিশ্চয়ই খোয়া গেছে।

—দেখা যাক।

বৃদ্ধাকে একরকম ঠেলে দিয়ে হোমস প্রবেশ করলেন বৈঠকখানা ঘরে। আমি ও মহারাজ তাঁর পেছু পেছু পা বাড়ালাম।

ঘরের আসবাবপত্র সব এলোমেলো, তাকগুলো খালি, ফাঁকা ড্রয়ারগুলো খোলা। ঘরের চেহারা দেখে মনে হল, ভদ্রমহিলা পালাবার

আগে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খুঁজেছেন। হোমস এবার এগিয়ে গেলেন ঘন্টার দড়ির কাছে। টান মারতেই আলগা তক্তাটা ভেঙে গেল। হাত ঢুকিয়ে একটা ফটো ও একটা চিঠি বের করে নিয়ে এলেন হোমস।

আইরিন অ্যাডলারের ছবি, পরণে সান্ধ্য পোশাকে সুসজ্জিতা। পত্রটির শিরোনামায় লেখা—শ্রীযুক্ত শার্লক হোমস সমীপেষু।

শার্লক হোমস ছিড়ে ফেললেন খামখানা। আমাদেরও দৃষ্টি আবদ্ধ হল সেই দিকে। তিন জোড়া চোখে একসঙ্গে পড়তে লাগলাম—। সময়—গতরাত্রি বারোটা। বিষয়বস্তু—

···প্রিয় মিস্টার শার্লক হোমস, আপনার কার্যবিধি প্রশংসনীয়, আমাকে ঠকাতে চেয়েছিলেন। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আগুনের চিৎকার শোনার আগে আমি কোনরকম সন্দেহ করতে পারি নি। কিন্তু বুদ্ধির দোষে নিজেকে ধরা দিচ্ছি, একথা খেয়াল হতেই ভাবতে শুরু করলাম। মনে পড়ে গেল, মাহরাজ আপনাকে নিযুক্ত করবেন, একথা শুনেছিলাম। আপনার ঠিকানা আমি জানতাম। কিন্তু সব জেনে শুনেও আপনার বুদ্ধি কৌশলে গোপন তথ্য প্রকাশ করতে বাধ্য হলাম। সন্দেহ জাগার পরও একথা ভেবে সঙ্কোচ হচ্ছিল যে একজন সহৃদয় বৃদ্ধ পুরোহিতের সম্বন্ধে একথা ভাবা ঠিক নয়। আমি একজন পাকা অভিনেত্রী, একথা নিশ্চয়ই অজানা নয়। তাই অতি সহজে পুরুষের ছদ্মবেশ নিলাম। কোচম্যান জনের উপর আপনার পাহারার ভার দিয়ে আমি চলে আসি এবং আপনাকে অনুসরণ করি।

···অবশেষে আমার অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হল। দেশবরেণ্য মিস্টার শার্লক হোমসের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি বুঝে আপনাকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমি টেম্পলে রওনা হলাম, স্বামীর সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায়ে।

···অবশেষে আমরা দুজনে স্থির করলাম, প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে বাঁচতে হলে পালানোই একমাত্র উপায়। অতএব আগামী কাল এসে

দেখবেন শিকার পালিয়েছে। আর আপনার মক্কেল যেন ফটোগ্রাফ সম্বন্ধে চিন্তা না করেন। আমার স্বামী মহারাজের চেয়েও উন্নত ধরনের মানুষ, তিনি আমাকে ভালোবাসেন, আমার প্রেমাস্পদ। মহারাজ জেনে রাখতে পারেন, তিনি যার প্রতি নিষ্ঠুর অবিচার করেছেন, তার দিক থেকে কোন আঘাত আসবে না। তিনি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন। আমার নিরাপত্তার কথা স্মরণ করে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই ছবিটা রেখে দিলাম। রাজা আমার ক্ষতি করতে সাহস করবেন না। আরেকটি ছবি রেখে যাচ্ছি ইচ্ছা করলে উনি ওটা নিতে পারেন।

—চিরদিনের অনুগতা আইরিন নর্টন,
ভূতপূর্ব অ্যাডলার।

মহারাজ এবার চিৎকার করে বলে উঠলেন—অদ্ভুত মেয়ে। আমি আগেই বলেছি, ও জেদী আর চটপটে। যদি আমার রানী হয়ে পাশে থাকতো কি দারুণ মানাতো। কিন্তু ভগবান বাধ সাধলো, ও যে আমার পাল্টি ঘর নয়।

হোমস নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললেন—মহিলাটির সঙ্গে আমার যতটুকু পরিচয় হয়েছে, তার মধ্যে বুঝেছি, আপনার তুলনায় তিনি স্বতন্ত্র শ্রেণীর। মহারাজের মামলার পরিণতি যেমনটি আশা করেছিলাম, তা না হওয়াতে আমি দুঃখিত।

মহারাজ পুলকিত হয়ে বললেন—এর থেকে আর কি বেশি আশা করা যায়। আমি জানি, তার কথার দাম আছে। ফটোগ্রাফটা পুড়ে গেলে যেমন নিশ্চিন্ত হতাম, এখনও তাই হয়েছি।

—মহারাজের কথা শুনে খুশী হলাম।

—মিস্টার হোমস, আপনি আমার দারুণ উপকার করেছেন। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বলুন, আপনাকে কি পুরস্কার দিতে পারি? যদি এই আংটিটা……

কথা শেষ না করেই মহারাজ তার হাতের আঙুল থেকে মরকত আংটিটি খুলে হাতে নিলেন।

হোমস বললেন—আংটির প্রয়োজন নেই। আপনার কাছে এমন জিনিস আছে যার দাম আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

—বলুন, সেটা কি ?

—এই ছবিটা আমি চাই, মহারাজ।

একথা শুনে মহারাজ ভীষণ অবাক হলেন। হাসলেন—ছবি ! আইরিনের ! বেশ তো, আপনার ইচ্ছা হলে একশোবার পাবেন।

—ধন্যবাদ মহারাজ। এবার আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে আমরা বিদায় প্রার্থনা করছি।

মাথা নীচু করে হোমস অভিবাদন জানালেন মহারাজকে। তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য মহারাজ হাত উঁচু করলেন, কিন্তু হোমস পেছন ফিরে তাকালেন না।

একজন রমণীর চাতুরতার কাছে শার্লক হোমসের চমকপ্রদ ফন্দি কিভাবে পরাস্ত হয়েছিল, কিভাবে বোহেমিয়ার রাজ্য নিদারণ কলঙ্কের সম্মুখীন হয়েছিল—এই হল তার বিবরণ।

এ ঘটনা ঘটার আগে হোমস মেয়েদের বুদ্ধি নিয়ে উপহাস করতেন। কিন্তু তাঁর এই অভ্যাস দূর হল। যখন তিনি আইরিন অ্যাডলার বা তার আলোক-চিত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতেন, তখনই হোমস 'মহিলা' বিশেষণটি ব্যবহার করতেন।